চতুর্থ অধ্যায়

নাথ সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ

নাথ সম্প্রদায়ের সাধন, ভজন, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গুরুদের অলৌকিক মহিমাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাকেই বলা হয় নাথসাহিত্য। এই নাথ সম্প্রদায় 'যুগী' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শব্দটি এসেছে 'যোগী' শব্দ থেকে। আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখের নাম ভারতীয় যোগী সম্প্রদায়ে সুবিদিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষান্তে 'নাথ' পদবী যুক্ত করা হয়, তাই উহারা বর্তমানে 'নাথযোগী সম্প্রদায়' বা 'নাথপন্থী' হিসেবে সমাজে পরিচিত। ------ বঙ্গদেশে নাথ সম্প্রদায় ও নাথ ধর্ম্মের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমেই 'নাথ' পদবীধারী বঙ্গীয় যোগী জাতির কথা মনে হয়।[১]

বাংলা সাহিত্যে 'নাথ' শব্দটি নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। অনেকের মতে, 'নাথ' শব্দটি বৈদিক 'জ্ঞাত' থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ হল সুশিক্ষিত শাস্ত্রবিদ এবং তত্ত্বজ্ঞ। আবার 'নাথ' শব্দটি 'নাদ' থেকেও আসতে পারে, যার অর্থ হল শব্দ ধ্বনি বা গর্জ্জন ধ্বনি। কারণ নাথ যোগীরা সর্ব্বদা মুখে একপ্রকার ওঁ কার ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। এছাড়া নাথযোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন তাদের উৎপত্তি হয়েছে আদিনাথ শিব থেকে। অপরদিকে, শব্দটির আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তার 'বাংলা ভাষার অভিধানে' 'নাথ' শব্দটিকে হিন্দুর (বিশেষতঃ যোগী জাতির) জাতীয় উপাধি বলেছেন।[২]

আদিকাল থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে যে তন্ত্রসাধনা বা যোগসাধনা চলে আসছে, নাথ ধর্ম হল তারই একটি অঙ্গ বা শাখা। অনেকের মতে এই শাখা বাংলাদেশেই প্রথম বিশিষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত ড. সুকুমার সেন লিখেছেন ''সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেকে আশ্রয় করিয়া একাধিক যোগসাধনার দ্বারা একদা পূর্বভারতে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা এখন নাথপন্থ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নামকরণের হেতু হইতেছে এই সাধনমার্গে

সিদ্ধ ও সাধকদিগের নামের সঙ্গে 'নাথ' শব্দের অস্তিত্ব। উত্তরবঙ্গ হইতে রাজপুতানা গুজরাট পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তরা স্থানে এখনো যে নিরঞ্জন পন্থী যোগী সন্ন্যাসী ভিক্ষুক সম্প্রদায় 'কনফট্', 'মচ্ছেন্দ্রী', 'সারঙ্গী হার', 'কানিপা' ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাঁহারা নাথ-পন্থেরই পথিক। বাঙ্গালাদেশে নাথপন্থী সাধুরা এখন শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্থেরা একটি পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত আছে।''[৩] তবে এই ধারার উদ্ভব ও বিকাশ যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, বাংলাদেশের বাইরেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকের মতে - ''নাথপন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বাইরের যোগী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ধারা যে বাঙ্গালাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়।''[৪] অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় আবার মনে করেন, ''নাথ সম্প্রদায় ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় হলেও ভারতের অনেক স্থানে তাদের অস্তিত্ব ছিল। যতদূর বোঝা যায়, নাথধর্ম মূলত বাংলা তথা পূর্বভারতের ধর্ম এবং এ ধর্ম এসেছে বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম থেকে।''[৫]

অতএব জানা যায় যে নাথধর্মের পন্থীদের এই যোগ সাধনার ঐতিহ্যের ধারা সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধধর্মের যোগাচার, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''সুকঠোর তপশ্চর্যা, দেহমনের সংযম, অনুশীলন, কৃচ্ছতা ইত্যাদির দ্বারা মানুষ অদ্ভুত, অনৈসর্গিক শক্তি অর্জণ করিতে পারে এরূপ বিশ্বাস প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যেমন স্বীকৃত হইয়াছিল, তেমনি আবার এই যোগানুশীলনের দ্বারা মোক্ষলাভ বা মুক্তিও অনায়াসলভ্য এরূপ বিশ্বাস ও চিন্তাশীল দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুসৃত হইয়াছিল, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে এই যোগ পন্থা বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাত্মপন্থী উভয় সমাজেই বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।''[৬]

এই নাথধর্মের ধারা বা শাখা শুধুমাত্র বাংলাদেশ তথা পূর্বভারতের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, এর বাইরেও এই ধারার বিস্তার ঘটে। যেমন - নেপাল, ভুটান, তিব্বত, সিকিম, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি উড়িষ্যা,

উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলেও নাথ আখ্যায়িকার পরিচয় পাওয়া গেছে। নাথধর্মে বিশ্বাসী সিদ্ধাচার্যগণ মনে করেন, দেহসাধনার দ্বারা জীবের মুক্তি ঘটবে এবং তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে দেহসাধনার দ্বারা জীব পঞ্চভৌতিক (কর্ম, কাম, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি) দেহকে সংস্কার করতে পারে, অমরত্ব লাভ করতে পারে। এদিক থেকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের সঙ্গে নাথধর্মের সাধনপ্রণালীর কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এমনকি উভয় সম্প্রদায়ের সাধকেরা বিশ্বাস করতেন যে কায়া সাধনার দ্বারা অমৃতকে সংরক্ষণ করে দেহকে অজর অমৃত করা যায়। পাশাপাশি উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, ধর্মতত্ত্ব এবং সাহিত্যের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। চর্যাগীতি এবং নাথসাহিত্য উভয় রচনায় সন্ধ্যা ভাষা বা আলোআধেরি ভাষা ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া নাথধর্মের প্রধান চারজন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে তিনজনই হলেন মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সিদ্ধা। যেমন - ১) কানু-পা বা কাহ্ন পা, ২) গুরু জলন্ধরি পা (কাহ্ন পা বা কানুর গুরু) বা হাড়ি পা এবং ৩) মীননাথ।

অনেকে মনে করেন, ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে পাল বংশের শেষ রাজা মদন পালের অবলুপ্তির পর অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ নাথধর্মে যোগদান করেন। এই নাথ সম্প্রদায়েরা না ছিল হিন্দু না ছিল মুসলিম। প্রসঙ্গত অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়নি অথবা মুসলমান হয়নি এমন অনেক বৌদ্ধবংশীয়ও নিশ্চয়ই ছিল। পাল আমলের বৌদ্ধদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল মহাযান পন্থী। ----- এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম থেকেই নাথধর্মের সৃষ্টি হল এবং পূর্বোক্ত না হিন্দু না মুসলমান বৌদ্ধদের নিয়ে নাথ সম্প্রদায় গড়ে উঠল বলে আমরা মনে করি।''[৭] সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে বাংলায় নাথধর্মের উদ্ভব হয়েছে চর্যাগীতির সময় থেকেই। অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে সমগ্র উত্তরভারতে এই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতেন। এরাই গোরক্ষপন্থী নাথ সম্প্রদায় নামে পরিচিত। পশ্চিম ভারতেও এঁদের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। দশম শতাব্দীতে এঁদের উদ্ভব হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে কিন্তু নাথ সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এঁদের ধর্ম কর্ম ও আচার আচরণকে কেন্দ্র করে বহু পুথিপত্র, পাঁচালী, লোকগীতি ও আখ্যান কাব্য ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুরের সঙ্গে নাথ সাহিত্যের আদিনাথ নিরঞ্জন অভিন্ন বলে মনে হয়।

মনসাবিজয় কাব্যের রচয়িতা বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের সৃষ্টি বর্ণনার মধ্যে সেই পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

এই নাথধর্মকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে দুটি সাহিত্য শাখা গড়ে উঠেছে। প্রথমটি 'গোরক্ষবিজয়' (গোর্খ-বিজয়) বা 'মীনচেতন' এবং দ্বিতীয়টি 'ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান' বা 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। প্রথম কাব্যটিতে রয়েছে গোরক্ষনাথের বিজয় কাহিনি এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে রাণী ময়নামতী ও তার পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস কাহিনি। তবে কাব্য দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হলেও একে অন্যের পরিপূরক। কাব্যের প্রথম শাখাটি দ্বিতীয় শাখাটির চেয়ে তুলনামূলক অনেক বেশি প্রাচীন এবং দ্বিতীয় শাখাটি প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। এখনো পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ বিষয়ক তিনখানি পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি হল -

১। শেখ ফয়জুল্লা প্রণীত 'গোরক্ষবিজয়'। পুথিটির লিপিকাল বাংলা ১১৮৪ সাল। পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩২৪ সালে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২। কবি শ্যামদাস সেন প্রণীত 'মীনচেতন'। পুথিটির রচনাকাল ১২২৪ সাল। পুথিটি ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩২২ সালে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

৩। ভীমসেন প্রণীত 'গোর্খবিজয়'। পুথিটির রচনাকাল ১২৬৩ সাল। পুথিটি সেই বছরেই বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ থেকে ড. পঞ্চানন মন্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন কবি দ্বারা গোরক্ষবিজয় কাব্য রচিত হলেও প্রত্যেক কবির কাব্যের মূল বিষয় হল গোরক্ষনাথের বিজয়কাহিনি বর্ণিত করা। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ দেবী পার্বতীর চক্রান্তে প্রলুব্ধ হয়ে অভিশাপ গ্রহন করে কদলী রাজ্যে প্রবেশ করে। সেখানে বিভিন্ন ব্যভিচারী নারীর সঙ্গতি লাভ করে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তাঁর জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। একথা জানতে পেরে শিষ্য গোরক্ষনাথ অনেক কৌশলে গুরুকে উদ্ধার করে কদলী রাজ্যের বাইরে নিয়ে আসে এবং তাকে যোগাসিদ্ধ জ্ঞানের কথা স্মরণ করে দেয়। এভাবেই শিষ্য গোরক্ষনাথ বিজয় প্রাপ্ত হয়।

নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয় শাখাটি হল ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান। এখানে রাজা মানিকচন্দ্র, স্ত্রী ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবনের বর্ণনাই হল কাহিনির মূল লক্ষ। তবে সমগ্র বঙ্গদেশে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কাব্যোপাখ্যান রচিত হয়েছে (মৌখিক ও লিখিত) সেগুলি হল - [৮]

১। ভবানী দাস বিরচিত গোপীচন্দ্রের পাঁচালী এবং

২। সুকুর মহম্মদ বিরচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।

কাব্যদুটি পরবর্তীকালে একত্রে ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩। গোপীচন্দ্রের গীত এবং

৪। ময়নামতীর গান ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত।

৫। দুর্ল্লভ মল্লিক সঙ্কলিত, শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'গোবিন্দ চন্দ্র গীত' (১৩০৮)।

৬। মানিক চন্দ্র রাজার গান - রংপুর হতে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেব সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত।

৭। নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক 'গোবিন্দ্রচন্দ্রের সন্ন্যাস' - পুথিটি বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে বলে জানা যায়।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গ্রীয়ার্সন আবিস্কৃত রচনাটিকে মৌখিক সাহিত্য বলে মনে করা হয়। কারণ তিনি উত্তরবঙ্গের রংপুরে অবস্থানকালে সেখানকার কয়েকজন কৃষকের মুখ থেকে এই উপাখ্যান বা গানটি লিখে নেন। পরবর্তীকালে সেই গানটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় "The Song of Manik Chandra" নামে দেবানগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়। দেবানগরী অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ার জন্য তা সাধারণ জন সমাজে বিশেষ প্রচার

লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনায় (প্রথম সংস্করণ ১৮৯৬)। তবে অবশ্য গানটিকে মৌখিক সাহিত্য বলতে চাননি ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - ''১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন সাহেব দেবনগরী হরফে একটি মৌখিক গীতিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই 'মানিকচন্দ্র রাজার গান'। যোগী সম্প্রদায়ের গায়েনেরা রংপুর অঞ্চলে এখনও গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী গাহিয়া বেড়ায়। সাধারণত তাহারা এই সমস্ত গান ও আখ্যান একখানি খাতায় টুকিয়া রাখে। ইহাকে 'যুগীর পুথি' এবং এই প্রকার কাহিনীকে 'যোগীযাত্রা' বলে। ড. গ্রিয়ার্সন উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের এক যোগী গায়কের নিকট হইতে এই গীতিকাটি সংগ্রহ করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। গ্রিয়ার্সন কাহারও মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন অথবা কেহ পুথির মুখস্ত পাঠ আওড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা পরিস্কার বুঝা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয় রংপুর অঞ্চলে যে সমস্ত 'যোগীর পুথি' প্রচলিত আছে, গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' সেইরূপ একটি আখ্যানের অংশ। সুতরাং গ্রিয়ার্সনের গানটিকে পুরাপুরি মৌখিক সংগ্রহ বলা যায় কি না সন্দেহ।''[৯]

কিন্তু গোপীচন্দ্রের গান যে মৌখিক সাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত তা জানা যায় বিশ্বেশ্বর ভট্ট াচার্যের সংগৃহীত গান থেকে। কারণ গ্রিয়ার্সন সাহেবের আবিস্কৃত গানের পরবর্তীকালে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় রংপুরের নীলফামারী অঞ্চলের তিনজন যোগী ভিখারীর কাছ থেকে গোপীচন্দ্র গানের আখ্যান লিখে নেন। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে সঙ্গে করে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। আবিস্কৃত আখ্যান কাব্যদুটিকে পাশাপাশি রাখলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের লক্ষণ স্পষ্ট বোঝা যায়। যদিও গ্রিয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত গানটির তুলনায় বিশ্বেশ্বর ভট্ট াচার্যের গানটি অধিকতর বিস্তৃত। দু'বছর পর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গোপীচন্দ্রের গানের দ্বিতীয় খণ্ড; যাতে রয়েছে ভবানীদাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালি' এবং সুকুর মহম্মদের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। সম্পাদনা করেন প্রথম খণ্ডের সম্পাদকরাই। সুতরাং প্রথম খণ্ডটি মৌখিক সাহিত্য অবলম্বনে লিখিত সাহিত্য। আবার পরবর্তীকালে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য দুটি খণ্ডকে একত্রে 'গোপীচন্দ্রের গান' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬) নামে ভূমিকা সহ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। এমনকি তিনি ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটির তৃতীয় সংস্করণও বের করেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় যেহেতু 'নাথ সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ' সেহেতু উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আখ্যান কাব্য নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান

গোপীচন্দ্রের গান কাব্যের পরিচয় : নাথ সাহিত্যের দুটি শাখার মধ্যে একটি হল ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান। গানটি লোকসাহিত্যের অর্ন্তগত। তবে গানটি ঠিক কোন সময় থেকে প্রচলিত ছিল অথবা গানটির প্রকৃত রচয়িতা কে সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তত্ত্ব পাওয়া যায় না। গানটির প্রথম সংগ্রাহক ছিলেন গ্রিয়ার্সন সাহেব। তিনি গানটি সংগ্রহ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আবার গানটির দ্বিতীয় সংগ্রাহক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগ্রহ করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কিন্তু গানের যে বিষয়বস্তু রাজা গোপীচন্দ্রের পিতার সময়কাল ধরা হয় একাদশ শতাব্দী। তাছাড়া গানটি যেহেতু মৌখিক সাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল, আর এই মৌখিক সাহিত্য স্মরণাতীত কাল থেকে স্মৃতি শ্রুতির পথ ধরে বাহিত হয়ে আসে। অতএব গোপীচন্দ্রের গানকে একান্তভাবে কোনো একটি নির্দিষ্টকালের সাহিত্য বলা যায় না। এ বিষয়ে স্বয়ং আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত গ্রহনযোগ্য - ''খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহা রংপুর জেলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদিগের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর উপকরণও আসিয়া মিশ্রণ লাভ করিয়াছে; কারণ মৌখিক সাহিত্যের ইহাই ধর্ম। সুতরাং ইহাকে একান্তভাবে প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বা উক্ত সমাজের পরিচয় বলিয়া গ্রহন করিলে ভুল হইবে, বরং ইহা প্রাচীন একটি ভিত্তির উপর আধুনিক বাংলার আঞ্চলিক একটি পল্লীসমাজের পরিচয় বলিয়া গ্রহন করাই সঙ্গত হইবে।''[১০]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খন্ডের ভাষা সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। গানটির প্রচলন হতে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের রংপুর, গোয়ালপাড়া, দিনাজপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে। 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যোপাখ্যানটিতে রাজা মানিকচন্দ্র, স্ত্রী ময়নামতী, গুরু হাড়িপা, পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবন এবং স্ত্রী অদুনা

পদুনা রাণীর সামাজিক জীবনচিত্র ইত্যাদির ছবি ফুটে উঠেছে। এই গানের মূল বিষয় হল রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। মন্ত্র সাধনায় যে এক অদ্ভুত শক্তি লাভ করা যায় তারই উদাহরণ বারংবার উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। রাণী ময়নামতী ছিলেন তন্ত্র সাধনার বলে মহাজ্ঞানের অধিকারিণী। কিন্তু তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও স্বামী মানিকচন্দ্র মহাজ্ঞান শিখতে চাননি বলে অকালে দেহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে নিজ সন্তান গোপীচন্দ্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকেও তিনি মহাজ্ঞান শিক্ষা নিতে বলেন। কিন্তু পুত্র গোপীচন্দ্র তরুণ যৌবনে স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহন করতে চাননি বরং মায়ের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে। মাতা ময়নামতী অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে এক প্রকার বাধ্য করে পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহন করতে। সন্ন্যাস গ্রহন করার পর সে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে মহাজ্ঞান লাভ করে সংসারে ফিরে আসে এবং নিজের অকাল মৃত্যুকে পরিহার করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ কাব্যটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নাথ সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব এবং যোগ শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করা। কিন্তু তা বলে কাব্যের কোথাও কখনো মানবিক জীবনরসের হানি ঘটানো হয়নি। আর সেই কারণেই নাথসাহিত্য শুধুমাত্র কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের (নাথ সম্প্রদায়) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এই সাহিত্য হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সাহিত্য। সুতরাং মধ্যযুগীয় সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও নাথসাহিত্য ব্যতিক্রমী সাহিত্য হয়ে উঠেছে এবং এখানেই এই সাহিত্যের সার্থকতা।

গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনিটি উত্তরবঙ্গের রংপুরের কৃষক সমাজে প্রচলিত ছিল। আজও উত্তরের পথে ঘাটে ভালো করে অনুসন্ধান করলে শোনা যাবে ময়নামতী - গোপীচন্দ্রের গান। তবে এই কাহিনিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত পুথি পাওয়া গেছে তাতে কবি দুর্ল্লভ মল্লিক, কবি ভবানীদাস, কবিসুকুর মহম্মদ ও কবি হাসামদীনের ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যটি যেহেতু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রংপুরের কৃষকদের মুখ থেকে শুনে সরাসরি লিখে নিয়েছেন, সেহেতু এই গানের ভণিতায় কোনো কবির নাম নেই।

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যটি মোট পাঁচটি খণ্ডে এবং ত্রিশটি পালায় বিভক্ত। এই পাঁচটি খণ্ড হল - ১। জন্ম খণ্ড - মানিকচন্দ্র রাজা, অভিশাপ, বজ্রতৃষ্ণা, যমযুদ্ধ, গোপীচন্দ্র (মোট ৫টি); ২। বুঝান খণ্ড - রাজ্যভোগ, মাতৃ অপরাধ, ধর্মোপদেশ, জননীর

পরীক্ষা (মোট ৪টি পালা); ৩। পণ্ডিত খণ্ড - অদুনা পদুনার ষড়যন্ত্র, পণ্ডিতের দণ্ড (মোট ২টি); ৪। মুণ্ডন - নাপিতের দুর্বুদ্ধি, রাজার বিচার (২টি) এবং ৫। সন্ন্যাস খণ্ড - যাত্রার উদ্যোগ, জননীর ভিক্ষাদান, পত্নীর ভিক্ষাদান, যাত্রাপথে, অরণ্যপথ, মরুপথ, কলিঙ্গার হাটে, নটীর ক্রিতদাস, প্রলোভন, নটীর রূপসজ্জা, প্রতিহিংসা, পূর্বস্মৃতি, শেষ দুঃখ, রক্তের লিখন, পরিত্রাণের উপায়, প্রত্যাবর্তনের পথে, পুনর্মিলন (মোট ১৭টি)। অতএব সর্বোমোট ৩০টি পালা। এই পালাগুলির মধ্যে দিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি ক্রমান্বয়ে ঘটেছে।

গোপীচন্দ্রের গান কাব্যে ঐতিহাসিকতা

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, আদৌ তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা অথবা কাব্যের প্রধান চরিত্র রাজা গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্যতা আছে কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। শরৎচন্দ্র দাস সর্বপ্রথম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'Antiquity of Chittagong' প্রবন্ধে গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন। গোপীচন্দ্রের পিতা হলেন মানিকচাঁদ। এই মানিকচাঁদও ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ড. গ্রিয়ার্সন সাহেব রাজা মানিকচন্দ্রকে চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ড. দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন যে বাংলার রাজা মানিকচন্দ্র ছিলেন একাদশ শতাব্দীর লোক।[১১]

গোপীচন্দ্র যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ১০২৪ খ্রিঃ উড়িষ্যার তিরুমালয় পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে। লিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে দক্ষিণীয় রাজা রাজেন্দ্র চোল বঙ্গাল রাজ গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। প্রসঙ্গত এই সত্যতা স্বীকার করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''প্রথমত : উড়িষ্যায় রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয় পর্বতগাত্র উৎকীর্ণ শিলালিপি। ইহার তারিখ ১০২৪ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে লিখিত আছে যে, রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তিতে ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বঙ্গাল দেশে গোবিন্দ্রচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ে কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোনো স্থানে মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল একটি শিলালিপি প্রচার করিয়া তাহাতে তাঁহার বিজিত দেশ সমূহের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১০২০

খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তিনি বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।''[১২] এছাড়া এই শিলালিপিতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে পূর্ববঙ্গে এক চন্দ্র উপাধিকারী রাজবংশ রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের ধারা হল - পূর্ণ চন্দ্র - সুবর্ণচন্দ্র - ত্রৈলোক্যচন্দ্র - শ্রীচন্দ্র। আবার মহারাষ্ট্রীয় গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনিতে দেখা যায়, গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র বা তিলকচন্দ্র। এই গোবিন্দচন্দ্রই যে রাজা গোপীচন্দ্র তার পরিচয় পাওয়া যায় দুর্ল্লভ মল্লিকের গ্রন্থ এবং উড়িষ্যার গাথার মধ্য দিয়ে।[১৩] আবার বাংলাদেশে প্রাপ্ত দুর্ল্লভ মল্লিকের পুথিতে পাওয়া যায় মানিকচন্দ্রের পিতামহের নাম ধারিচন্দ্র এবং পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র -

''সুবর্ণ্নচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা ।
তার পুত্র মানিকচন্দ ষুন তার কথা ।।''[১৪]

অতএব দেখা গেল যে, গোপীচন্দ্রের ইতিহাস সম্পর্কে কোথাও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে এটুকু নিশ্চিৎভাবে বলা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল যখন বাংলার গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন (একাদশ শতাব্দীতে) তখন পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ নামে এক রাজবংশ রাজত্ব করতেন।

অপরদিকে, 'শব্দপ্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থের মধ্যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় - ''ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে 'শব্দপ্রদীপ' নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় আছে। গ্রন্থকারের নাম সুরেশ্বর। সুরেশ্বর রাজা ভীম পালের অন্তরঙ্গ ভিষক ছিলেন। সুরেশ্বরের পিতা ভদ্রেশ্বর বঙ্গেশ্বর রামপালের রাজ্যে কবিরাজ ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বৈদ্য ছিলেন। গ্রন্থে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আর কোনো পরিচয় নাই। গ্রন্থে বর্ণিত রাজা রামপাল যদি পাল বংশের রামপাল হন তবে তার সময় দাঁড়ায় ১০৭৭-১১২০ খৃষ্টাব্দে। কৈবর্ত রাজ ভীম রামপালের প্রায় সমসাময়িক লোক। সুরেশ্বর ও দেবগণের মধ্যে তিন পুরুষের ব্যবধান। এক পুরুষের জন্য ২৫ বৎসর ধরলে দেবগণের সময় দাঁড়ায় একাদশ শতকের প্রথম দিকে। এ হিসাবে তিরুমলয় গিরিলিপির গোবিন্দচন্দ্র (১০২১-২৩) এবং 'শব্দপ্রদীপ' এর গোবিন্দচন্দ্র একই সময়ের এবং খুব সম্ভবত একই লোক।''[১৫] এ থেকে পন্ডিতেরা মনে করেন যে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন

একাদশ শতাব্দীর লোক। অনেকে আবার এই গোপীচন্দ্রকে গুপীচন্দ্র নামেও অভিহিত করেন।

বিভিন্ন পুথিতে রাজা গুপিচন্দ্রের বংশ পরিচয় বিভিন্ন রকম। যেমন - ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পুথিতে গুপিচন্দ্রের বংশ পরিচয় হল : ধড়াইচন্দ্র - নেপালচন্দ্র - শরূপাচন্দ্র - মানিকচন্দ্র - গোপীচন্দ্র। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের পুথিতে বালইচন্দ্র - পালচন্দ্র - রূকচন্দ্র - মানিকচন্দ্র - গুপীচন্দ্র। তবে ড. গ্রিয়ার্সন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত রংপুরের গাথাগুলিতে এবং ভবানীদাসের গ্রন্থে রাজা মানিকচন্দ্রের কোন বংশ পরিচয় নেই। উড়িষ্যার গাথা অনুসারে গুপীচন্দ্রের বংশতালিকা হল সুরচন্দ্র - তারাচন্দ্র - ব্রহ্মাচন্দ্র - গোপীচন্দ্র - মেহুচন্দ্র - বিষ্ণুচন্দ্র - রূপচন্দ্র - গোবিন্দচন্দ্র। মাতার নাম মুক্তা দেবী, গুরু হারিপা এবং প্রধান পত্নিদ্বয় রোদুমা ও পোদুমা।[১৬] মহারাষ্ট্রীয় গাথা অনুসারে গুপীচন্দ্র হল গৌড়বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চন নগরের রাজা ও ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও মৈনাবতীর পুত্র। জলন্ধর ছিলেন তার গুরু। হিন্দী উপাখ্যান অনুসারে, মহারাজা ভর্তৃহরির ভগ্নী মৈনাবতীর পুত্র গুপীচন্দ্র এবং কন্যা চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী সিংহল দ্বীপের রাজা উগ্রসেনের পত্নী। ভর্তৃহরি এবং মৈনাবতী উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য। লক্ষ্মণদাসের হিন্দি গাথা অনুসারে ধারনগরের রাজা গান্ধর্ব সেনের কন্যা মৈনাবতী। তাঁর স্বামী তিলকচন্দ্র, পুত্র গুপীচন্দ্র এবং কন্যা চম্পাদেবী। কৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসের 'রাজমালা' গ্রন্থ অনুসারে গুপীচন্দ্রের স্ত্রীর নাম ময়নামতী এবং কন্যা লাইমাই। কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে রাজা গুপীচন্দ্রের নিবাস ছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে গুপীচন্দ্রের বংশতালিকা হল : বৃক্ষচন্দ্র - বিগমচন্দ্র - কামচন্দ্র - সিংহচন্দ্র - বালচন্দ্র - বিমলচন্দ্র - গোবিন্দচন্দ্র - ললিতচন্দ্র।[১৭] অতএব দেখা যায় বিভিন্ন উপাখ্যানে গোপীচন্দ্রের বিভিন্ন পরিচয় রয়েছে। তবে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে ইতিহাসের গোবিন্দচন্দ্র বা পুঁথির গোপীচন্দ্র এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।[১৮]

গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র যে সত্যিই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি যে একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন তার পরিচয় মেলে কাব্যে বর্ণিত হাড়ি পা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল হাড়িপা বা জলন্ধরী পা। এই হাড়িপা হল আবার গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর গুরুভ্রাতা এবং এই হাড়িপার

কাছে থেকেই রাজা গোপীচন্দ্র মহাজ্ঞান লাভ করেন বলে গাথায় উল্লিখিত। পাশাপাশি এই হাড়িপা বা জলন্ধরী পার উল্লেখ পাই প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের মধ্যে। সেখানে কাহ্ন পা বা কৃষ্ণাচার্য পাদের গুরু হলেন জলন্ধরী পা। তিব্বতি সূত্র থেকে জানা যায় যে চর্যাপদের এই হাড়িপা বা জলন্ধরী পা ৯৫০ খ্রিঃ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে বঙ্গদেশে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং এই সূত্র থেকে মনে হয় যে গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র হলেন একাদশ শতাব্দীর লোক। তবে বেশ কিছু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হয় যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে সামনে রেখেই বঙ্গদেশে এই গীতিকার জন্ম হয়। ড. গ্রিয়ার্সনের আবিস্কৃত পুথির পর আরও বহু পুথি আবিস্কৃত হয়েছে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। বিশেষত 'ময়নামতীর গান' এবং 'গোরক্ষবিজয়' নামে কাব্য দু'টির যত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে একটিরও লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ শতকের পূর্বে নয়। তাই অনেকে এই কাব্যকে দশম-একাদশ শতকে অর্ন্তভুক্ত করতে চান নি। তবে পুথিগত প্রমাণের অভাব থাকলেও কাহিনির সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই গানের উদ্ভব হয়।[১৯]

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের বহু চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার নীলফামারী অঞ্চলে গোপীচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তার ভগ্নাশেষ এখনো আছে। এছাড়া রাণী ময়নামতীর কোট, ময়নামতীর গড়, রাজপ্রাসাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোট প্রভৃতি স্থান এখনো রয়েছে বলে জানা যায়। গোপীচন্দ্রের গুরু হাড়িপার বসতবাটি রয়েছে ময়নামতি কোটের কাছাকাছি। ভাঙা দালানবাড়ি দেখে মনে হয় ময়নামতী এবং তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র এখানে বাস করতেন। রংপুরের গাথানুসারে জানা যায় যে মানিকচন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ময়নামতী পিতা ফেরুসা নগরের রাজা তিলকচনের রাজ্যে রাজত্ব করেন। এই ফেরুসা নগর কোথায় ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না, তবে অনেকের মতে এই ফেরুসা নগর রংপুর জেলার ময়নামতী কোটকে বলা যেতে পারে। আবার রংপুরের গাথায় যে শ্রীকলার বন্দরের উল্লেখ রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই রংপুর জেলাতেই। স্থানটি রংপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ কাকিনা গ্রামের প্রাচীন স্থান। রাণী অদুনা-পদুনার নামে বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় দীঘির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানীদাসের কাব্যে মেহেরকুল শহরের কথা পাওয়া যায় -

''বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়ের সহর ।
দাদার মিরাশ এড়ি যাব কামলাক নগর ।।
তুমি মাত্রর জত বাড়ি কালিকা নগর ।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহেরকুল শহর ।।''[২০]

মেহেরকুল বলতে বাস্তবে কোনো শহরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কামলোক নগরকে কুমিল্লা ধরলে তা মেহেরকুলেই অবস্থিত। তবে লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে গোপীচাঁদের রাজধানী ছিল ত্রিপুরা জেলার মেহেরকুল নগরে। গোপীচন্দ্রের পিতা রাজা মানিকচন্দ্র ময়নামতীর বাসস্থানের জন্য মেহেরকুলে নতুন ভবন তৈরি করেন। এছাড়া ত্রিপুরা অঞ্চলেও ময়নামতী পাহাড়, লাইমাই পাহাড় প্রভৃতি স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ একই নাম একাধিক অঞ্চলে দেখা যায়। প্রসঙ্গত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''রংপুর হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ গোপীচন্দ্রের শাসনদণ্ড স্বীকার করিত এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। ----এক রাজার বাড়ী অবশ্য একাধিক স্থানে থাকিতে পারে। করতোয়া হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধীশ্বর না হইলেও মানিকচন্দ্র ও গোপীচাঁদের পাট ময়নামতী পাহাড় ও রংপুর জেলা উভয় স্থানেই থাকিতে পারে।''[২১]

রংপুর জেলা রাণী ময়নামতীর স্মৃতিকেই শুধু রক্ষা করেনি, তাঁকে দেবীত্বে রূপান্তরিত করে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে রংপুরে ময়নামতীকে কেন্দ্র করে ময়নাবুড়ীর পূজা ময়নামতীর কোটের উপরে সাদরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পূজায় ছাগলের মস্তক উৎসর্গ করা হয়। পূজায় পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত থাকেন রাজবংশী জাতীয় দেওদাঁ, ব্রাহ্মণ নয়। পূজায় মন্ত্র হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করেন চণ্ডীপূজারই মন্ত্র, তবে তা রাজবংশী সংস্করণ। এছাড়া রংপুরে বুড়িপূজা আজও বিস্তৃতভাবে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলাও এই বুড়ি পূজা হয়ে থাকে। 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ লিখেছেন, ''কোচবিহার এবং রঙ্গপুর অঞ্চলের হিন্দু সমাজে ময়নাবুড়ী অথবা 'বুড়ী'র পূজা হইয়া থাকে এবং শিশু সন্তানের উপর 'বুড়ীর ঝোঁক' (বুড়ীর কুদৃষ্টি) আছে এবং তথায়ই তাহার পূজা হইয়া থাকে।''[২২] এই থানগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য থান বা পাটের নাম হল কোচবিহার জেলার অন্তর্গত দিনহাটা মহকুমায় 'বুড়ীর পাট'। তিনি এই গান সম্পর্কে আরও বলেন, ''উত্তরবঙ্গের ময়নামতীর

গীতে মেচপাড়া, পাটীকানগর, শ্রীকলার বন্দর, কদলীসহর, কলিঙ্গ বন্দর, ফেরুসানগর, দারাইপুর এবং করতোয়ার নাম আছে। ইহাদের মধ্যে মেচপাড়া গোয়ালপাড়া জেলায়, শ্রীকলার বন্দর অথবা হাট এবং পাটীকানগর অথবা পাটীকাপাড়া রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনার উত্তরে, কদলীসহর অথবা কলাগাছী রঙ্গপুর নগরের উত্তরে অবস্থিত এবং করতোয়া নদী এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বনামে পরিচিত হইতেছে।''[২৩] কাব্যে উল্লেখ রয়েছে -

ক) ''দেবপুরের পাঁচকন্যা ডাকিনী ময়না কোন্দল লাগিল ।
দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল ।।
সেই ময়নাক ঘর বান্ধি দিল ফেরুসা নগরে ।''[২৪]

খ) ''একখান দিলে সিকিয়া বাঙ্কুয়া দুইটা জলের হাঁড়ি ।
জল ভরিবার যায় রাজা করতোয়া নদী ।।''[২৫]

গ) ''বোল্লাচাকি কলিঙ্গার রাজার গেইছে লাগিয়া ।
ঐ হাটক লাগি গুরু শিষ্যে গেলত চলিয়া ।।''[২৬]

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে রাজা গোপীচন্দ্র কোন্ রাজবংশের রাজা বা কোন গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। রংপুরের নীলফামারীর পাইটকা পাড়া বা পাটীকাপাড়া গ্রামে বেশীরভাগ জনসাধারণ ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই মনে করা হয় গোপীচন্দ্র ছিলেন রাজবংশী জাতি সম্ভূত। এ বিষয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সেনের মন্তব্য স্মর্তব্য ও গ্রহনযোগ্য। তিনি বলেছেন, ''পূর্বে আমি গোপীচন্দ্রকে রাজবংশীয় জাতীয় মনে করেছিলাম, ---- লিখিত দুইটি বিভিন্ন গাথায় যখন মিল আছে এবং গোপীচন্দ্রের প্রধান রাজপাট যখন রাজবংশী জাতির প্রভাবের বর্হিভাগে পাওয়া যাইতেছে, তখন আমরা অন্য বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া পর্যন্ত এই গ্রন্থ পরিচয় গ্রহন করিতেই বাধ্য।''[২৭] প্রথম গাথাটি অর্থাৎ ড. গ্রিয়ার্সন সাহেবের 'মানিকচন্দ্র রাজার গানে' গোপীচন্দ্রকে 'বোনিয়া জাতি' বা 'বেনে ক্ষত্রিয়' বলেছেন। দ্বিতীয় গাথাটিতে সুকুর মামুদ রাজাকে গন্ধের বণিক বলেছেন -

''কুলে শীলে ছিলে রাজা গন্ধের বণিক ।''[২৮]

আবার অনেকে গোপীচন্দ্রকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলেছেন। তবে খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ তাঁর গ্রন্থে গোপীচন্দ্রকে রাজবংশী জাতি সম্ভূত বলেই দাবি করেছেন।[২৯] সর্বোপরি

বলা যেতে পারে 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে উত্তরবঙ্গীয় রীতিনীতি এবং ভাষার ছাপ স্পষ্ট লক্ষ করা যায়।

গোপীচন্দ্রের গান কাব্যে সমাজ ভাবনা

নাথধর্মের সাধনভজন এবং নাথগুরুদের অলৌকিক মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে নাথসাহিত্য গড়ে উঠলেও এর মধ্যে দিয়ে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এরকমই একটি সাহিত্য হল 'গোপীচন্দ্রের গান'। প্রসঙ্গত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''নাথগুরুর অলৌকিক মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনা ইহার মূল উদ্দেশ্য নহে, বরং এক রাজপুত্রের জীবন কাহিনীর ভিতর দিয়া চিরন্তন মানুষেরই সুখ দুঃখের কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্যই ইহা ধর্ম এবং সম্প্রদায় নিরপেক্ষ আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে।''[৩০] কাব্যটি মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত। কারণ ''ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে রংপুর জেলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদের মুখ থেকে শুনে লেখা ফলে ইহাকে একান্তভাবে প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বা উক্ত সমাজের পরিচয় বলিয়া গ্রহন করিলে ভুল হইবে বরং ইহা প্রাচীন একটি ভিত্তির উপর আধুনিক বাংলার আঞ্চলিক একটি পল্লী সমাজের পরিচয় বলিয়া গ্রহন করাই সঙ্গত হইবে।''[৩১] শুধু তাই নয়, এই কাব্যের সামাজিক মূল্যায়ন সম্পর্কে তিনি আরও বলেন - '' 'গোপীচন্দ্রের গান' বাঙ্গালীর জাতীয় বা সমাজ-জীবনের রসোপকরণের ভিত্তির উপর রচিত। ইহার নির্বিশেষ কোন পরিচয় নাই। যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াই ইহা একদিন বাংলাদেশের বাহিরে প্রচারিত হউক না কেন, এ'দেশ ইহার যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবনোপকরণ দ্বারা গঠিত তাহা যতই আঞ্চলিক হউক না কেন, তথাপি ইহা যে বাঙ্গালীরই সমাজ এবং তাহারই জীবন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।''[৩২] সুতরাং 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে যে সমাজচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তা যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গীয় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।

তৎকালীন বাংলাদেশে তথা উত্তরবঙ্গের সমাজেও যে বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ উভয় প্রথার প্রচলন ছিল তা সুবিদিত। 'গোপীচন্দ্রের গান' থেকেও তা বোঝা যায়। কাব্যের শুরুতেই রাজা মানিকচন্দ্রের একাধিক বিয়ের কথা জানা যায় -

''মানিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা ।
ময়নাক বিভা করিল তার নও বুড়ি ভার্যা ।।
ময়নাক বিভা করি রাজার না পূরিল মনের আশ ।
তারপর দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিভা করি পূরি গেল মনের হাবিলাস ।।''[৩৩]

অন্যদিকে পিতার মতো পুত্র গোপীচন্দ্রও একধিক পত্নী লাভ করেন -

''অদুনাক বিভা কৈল্লে পদুনাক পাইল দানে
একশত বান্দী পাইল ব্যাভারের কারণে ।।''[৩৪]

বাল্য বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায় গোপীচন্দ্রের বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজার মধ্যে দিয়ে-

''সাত বছরকার বয়স হৈল পাটত বসিয়া
এখন পাত্রী দেখে বুড়ী ময়না ধিয়ানত বসিয়া ।।''[৩৫]

সমাজে বহুবিবাহের ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা যেত। সতীন সমস্যা প্রকট হলে বাধ্য হয়ে স্বামী স্ত্রীদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা করতেন, তার পরিচয় পাই মানিকচাঁদের মধ্যে দিয়ে -

''দেবপুরের পাঁচ কন্যা ডাকিনী ময়না কোন্দল লাগিল ।
দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল ।।
সেই ময়নাক ঘর বান্ধি দিল ফেরুসা নগরে ।।''[৩৬]

প্রথমদিকে রাজা মানিকচন্দ্র সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল প্রকার প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করত। তাদের তেমন কোনো অভাব অভিযোগ ছিল না, নিরাপত্তা ছিল সুনিশ্চিত এবং খাজনা ছিল খুবই সামান্য -

''হাল খানায় খাজনা ছিল দেড় বুড়ি কড়ি ।।
সেই যে রাজার রাইয়ত প্রজা দুঃখ নাহি পায় ।
- - - - - - -
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায় ।
সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওয়ালে খেলায়
হেন দুঃখী কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায় ।।

পাতবেচা হইয়া রাইয়ত পাত বেচায়া খায় ।
স্ত্রী পুরুষে যুক্তি করি হস্তী কিনিবার চায় ।।''[৩৭]

কিন্তু প্রজাদের এই সুখ বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করে না, কারণ দক্ষিণ দেশ থেকে বাঙ্গাল দেওয়ান এসে তাদের খাজনা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি করে -

''দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা দাড়ি ।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত্ কৈল কড়ি ।।
দেওয়ান গিরি চাকরি রাজা সেই বাঙ্গালক দিল ।
দেড় বুড়ি ছিল খাজনা পনর গণ্ডা নিল ।।''[৩৮]

এ থেকে সহজেই অনুমেয় হয় যে, সমাজে প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। একসময় তাদের হালের গরু এবং কোলের ছেলেকে পর্যন্ত বিক্রি করে খাজনা দিতে হয় -

''চাষা লোকে দেয় খাজনা হাল গরু বেচেয়া
সাউধ সদাগর দেয় খাজনা নাও নৌকা বেচেয়া ।।
ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলা কেথা বেচেয়া ।
লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল ।
খাজনার তাপত বেচায় দুধের ছাওয়াল ।।''[৩৯]

অতঃপর প্রজারা সম্মিলিতভাবে রাজা মানিকচন্দ্রকে অভিশাপ দিতে লাগলেন এবং তাকে মারার জন্য দেবতা মহাদেবের স্মরণাপন্ন হলেন। তৎকালীন সময়ে তন্ত্রমন্ত্রের উপর মানুষের বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তাই অত্যাচারী রাজা মানিকচন্দ্রকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায় তার চর্চা প্রজাদের মধ্যে চলতে লাগল এবং পরিশেষে মহাদেবের নির্দেশে জোটবদ্ধভাবে তারা রাজাকে অভিশাপ দিলেন -

''লেংটি চিপিয়া শাপ দিল সকলে মানিকচান বলিয়া ।
আঠার বছরের পরমাই ছিল রাজার ফেলাইল টুটিয়া ।।
এক মঙ্গলবার দিন রাজাক অভিশাপ দিল ।
ফের মঙ্গলবার দিন রাজার এজরি করিল ।।''[৪০]

এমতাবস্থায় রাণী ময়নামতী ফেরুসা নগর থেকে ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, স্বামী মানিকচন্দ্রের মৃত্যু আসন্ন। তাকে বাঁচানোর জন্য তিনি নানা তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্য নেন এবং নিজের শরীরের লব্ধ জ্ঞান নিতে বলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে পুরুষ শাসিত সমাজে স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে, তাই স্ত্রীর কাছ থেকে রাজা কোনো রূপ শিক্ষা নিতে চান নি। তার পরিচয় রয়েছে কাব্যে -

''আইস, আইস, প্রাণপতি, ভিতর অন্দর যাই ।
আমার শরীরের অমর গিয়ান কিঞ্চিৎ তোমাক শিখাই ।
স্ত্রী পুরুষে বুদ্ধি কৈরে যমের হাত এড়াই ।।
রাজা বলে, 'শুন, ময়না, ময়নামতী বাই ।
এমনি যদি আমার জাহান যায় মোক ছাড়িয়া ।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া ।
আইজ যদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া ।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিষ্য বেটা বলিয়া' ।।''[৪১]

স্ত্রীকে গুরু রূপে মানতে রাজার পৌরুষে লাগে। তাই সেই জ্ঞানকে সে অবজ্ঞা করে এবং ফলে তার অকাল মৃত্যু ঘটে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে কতটা নীচ চোখে দেখে তার পরিচয় পাই পুত্র গোপীচন্দ্রের কাছ থেকে। ছেলে হয়েও সে মাতার সিদ্ধ জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করেছে -

''পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ ।।
হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই ।
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই ।।''[৪২]

শুধু তাই নয়, গোপীচন্দ্র নিজ পুত্র হয়ে যেমন মাতার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তেমনি আবার মায়ের চরিত্রে পর্যন্ত কালিমা লিপ্ত করেছে -

''রাজা বলে 'শুন, জননি, জননি, লক্ষ্মী রাই ।
এ সব কথা মিথ্যা, মা, তোমার বিশ্বাস না পাই ।।

হাড়ির খাইছ গুয়া, মা, হাড়ির খাইছ পান ।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান ।।
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে, জননি, একত্র করিয়া ।
আমার পিতাক মারিছেন, মা, জহর বিষ খাওয়াইয়া ।
বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পাঠাইয়া ।
শেষে, বিটি, খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া ।।''[৪৩]

এই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ময়নামতীকে বহু পরীক্ষা দিতে হয়।

নারীর প্রতি এই হীন অপমানের চিত্র আরও পাওয়া যায় উৎকোচ বা ঘুষ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়ে। অদুনা পদুনা যেমন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণ এবং নাপিতকে ঘুষ দিয়েছেন, তেমনি আবার নিজ স্ত্রীদের কথায় তারা ঘুষ নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে নাপিতের স্ত্রী নাপিতকে বলেছে -

''পাঁচশ টাকা আসিলে তোর দরজায় সাজিয়া ।
এ গুলা টাকা নাপিত, টাকা নেও গণিয়া ।।
এয়ানে যদি ধর্মী রাজা মন্দ বলবে তাত ।
না থাকিম উঙার দেশে অন্য দেশে যাব ।
ঐ গুলা টাকা দিয়া গিরস্তি করি খাব ।।''[৪৪]

এ থেকে বোঝা যায় সে সময় সমাজে ঘুষের প্রচলন ছিল।

সাংসারিক গৃহকাজের পাশাপাশি নারীরা সে সময় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। হাট বাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন দোকান পাটের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায় গোপীচন্দ্রের গান কাব্যে -

''হলদি বেচি বলে, দিদি, কোমরক ছাড়েক তুই ।
হলদির দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি ।।
তেইলানি বলে, ওগো জ্যাঠাই কোমর ছাড়েক তুই ।
তেলের দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি ।।''[৪৫]

অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গের মহিলাদের মধ্যে যে ব্যবসা বানিজ্যের প্রচলন ছিল তা বোঝা যায়। মেয়েদের এই বাজার ঘাট করা সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, ''ময়নামতী যে হাটবাজারে যাইতেন, তাহাও 'হিন্দু রাজত্বের সময়কার' কথা নহে। যে উত্তরবঙ্গে 'গোপীচাদের গানে'র ব্যাপক প্রচলন ছিল, সেখানকার কোচ এবং রাজবংশী স্ত্রীলোকগণ এখনও সর্বদাই নিজেরাই হাট-বাজার করিয়া থাকেন, পল্লীর গায়েন তাঁহার সমাজের সমসাময়িক একটি চিত্রই এখানে বর্ণনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গায়েনের হিন্দুরাজত্বের একটি ঐতিহাসিক সমাজ চিত্র পরিবেশণের কোন দায়িত্ব পালন করিবার কথা নহে। ইহা দ্বারা যে অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে, তাহাও 'হিন্দুরাজত্বে'র সমকালীন কোন চিত্র বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, তাহাও উত্তরবঙ্গের মাতৃতান্ত্রিক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির বংশধর কোচ, বোড়ো ও রাজবংশী জাতিরই একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য মাত্র।''[৪৬]

সমকালীন সময়ে বিবাহবস্থায় যৌতুক লেনদেনের রীতি প্রচলিত ছিল। রাজারা পর্যন্ত এই যৌতুক গ্রহণ করতেন। যেমন, রাজা গোপীচন্দ্রের বিবাহে তার উল্লেখ রয়েছে -

''অদুনাক বিভা কৈল্লে পদুনাক পাইল দানে ।
এক শত বান্দী পাইল ব্যাভারের কারণে ।।''[৪৭]

অর্থাৎ সে সময় অন্যান্য দান সামগ্রীর সঙ্গে শ্যালিকাকে দান রূপে লাভ করার প্রথা অভিনব বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই কাহিনির স্বাভাবিকতার সমর্থনে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে নববধূর সঙ্গে দাসী প্রদানের প্রথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কন্যার সঙ্গে দাসীর অনুগমন এবং শ্যালিকা দান একই প্রথা নয়। সুতরাং পত্নীরূপে শ্যালিকাকে দান সম্ভবত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ জীবনেরই একটি আনুষ্ঠানিক চিত্র।[৪৮]

অদুনা পদুনা নারী চরিত্র দুটি যেন আমাদের পরিচিত সমাজের শাশ্বত নারী চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। সন্ন্যাস যাত্রার প্রাককালে গোপীচন্দ্র তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ফুটে ওঠে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার চিরকালীন মমত্বের ছবি -

''কান্দে অদুনা রাণী ধরিয়া রাজার পাও ।
এ হেন বয়সের বেলা ছাড়িয়া না যাও ।।

ছাড়িয়া না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর ।
কার জন্যে বান্ধিলেন শয়ন-মন্দির ঘর ।।
শয়ন মন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি ।
এমত বয়সে ছাড়ি যাও বৃথায় গাভুরালি ।।
- - - - - - - - - -
আমাকেও সঙ্গে নিয়া যাও, পরাণের রঘুনাথ ।
আমি নারী সঙ্গে গেলে রান্ধিয়া দিব ভাত ।।
ভোকের কালে অন্ন দিব তিয়াস কালে পানি ।
হাসিয়া খেলিয়া প্রভু পোহাব রজনী ।।''[৪৯]

শুধু তাই নয়, সুকুর মহম্মদের কাব্যে তাদেরকে বলতে দেখা যায় -

''নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব ।
মস্তকের চুল কাটিয়া চামুর ঢুলাইব ।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা পলেতে পাকাইব ।
পৃষ্ঠের চর্ম কাটি আমরা চান্দয়া টাঙ্গাইব ।
দশ নখ কাটিয়া আমরা দশ বাতি দিব ।
পায়ের মালই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব ।।''[৫০]

শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক বাঙালি সমাজে চিরকাল তিক্ততার সম্পর্ক। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস যাত্রা নিয়ে ময়নামতী এবং অদুনা পদুনার মধ্যে সেই চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। স্ত্রীদের কথায় পুত্র যেমন মায়ের চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করেছেন তেমনি আবার নিজের জীবনের কথা স্মরণ করে মাতা পুত্রবধূদের সম্পর্কে বলেছেন -

''বাঘিনী বধূর কথা শোনেক মায়ের ঠাঞি ।
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস যা নিবুর্দ্ধি কানাই ।।
বাঘের নাকান ত্রঙ্গা পেঙ্গা বিলাইয়ের নাকা বৈসে ।
মায়ের নাকা অন্ন স্পর্শে ব্রহ্মার নাকা চোসে ।।
- - - - - - - -

স্বামীর পাতে অন্ন দিয়া যায় শাঙ্কা মাজিবার ।
শাঙ্কা মাজিয়া বধূ হস্তের দিকে চায় ।
কোন দিকে ভাল পুরুষ পন্থ বৈয়া যায় ।
হাতের হিঞালি দিয়া বধূ ভ্রমরা ভুলায় ।।''[৫১]

অপরদিকে তার চরিত্রের মধ্যে রয়েছে একজন বাঙালি মায়ের স্নেহ কোমল হৃদয়। তাই সন্ন্যাস যাত্রার প্রাক্‌কালে নিজ সন্তানকে আদর যত্ন করে খাইয়েছেন -

''এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ধন করিয়া ।
সুবর্ণের থালেতে রন্ন দিল পারস করিয়া ।।
চৌকিয়া পিড়া দিলে বসিবার লাগিয়া ।
ছাইলাক ডাকায় বুড়ী ময়না কান্দিয়া কাটিয়া ।
আইস, আইস, যাদুধন দুঃখিনীর দুলালিয়া ।।
রন্ন খাইয়া যাও যাদু বৈদেশ লাগিয়া ।''[৫২]

সে সময় সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণ, নাপিত, হাড়ি ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি নীচু জাতের ব্যক্তিদের যে হীন দৃষ্টিতে দেখা হত তার উল্লেখ পাই গোপীচন্দ্রের উক্তিতে -

''যখন ধর্মীরাজা হাড়ির নাম শুনিল ।
'রাধাকৃষ্ণ রাম রাম'- কর্ণে হস্ত দিল ।।
ওগো, মা জননি, ডুবালু, মা, জাত কুল আর সর্ব গাঁও ।
বাইশ দণ্ড রাজা হইয়া হাড়ির ধরব পাও ।।
হাট সামটে হাড়ি বেটা না করে সিনান ।
কোথা হৈতে পাইল তিনি চৈতন্য গিয়ান ।।''[৫৩]

নেশা দ্রব্যের উল্লেখ থেকে মনে হয় সে সময় সমাজের মানুষ নেশা সেবন করত। পাশাপাশি পশুকে মত্ত করে তোলার জন্য হাতিকে মদ ভাং খাওয়ানো হত। যেমন - নাপিতকে খুঁজে আনার জন্য মদভাং খাইয়ে হাতিকে মত্ত করে তোলা হয়েছে -

''মদভাং খাওয়াই লেক হস্তীক বিস্তর করিয়া ।

একখান কোদাল দিলে হস্তীর শুঁড়তে বান্ধিয়া ।।
নাপিতের মহলক লাগি যাইছে চলিয়া ।।''[৫৪]

এই ছবি উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। নীচু জাতের মানুষেরা যে নেশা করত তার উল্লেখ পাই গুরু হাড়িপার চরিত্রে -

''বার কড়া কড়ি দে আমাক গাঞ্জা কিনিয়া খাই ।।
গাঞ্জা কিনিয়া খাইয়া আমি গায় করি বল ।
তবে নি ধরিয়া যাইম তোক ডারাইপুর সহর ।।''[৫৫]

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের মধ্যে সমকালীন আচার, সংস্কার, রীতি -নীতি, বিশ্বাস - অবিশ্বাস ও অলৌকিকতার বহু উদাহরণ রয়েছে, যা থেকে আমরা সহজেই তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জানতে পারি। কাব্যে অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃতের পরিচয় পাই প্রজা, ময়নামতী এবং হাড়ি পা প্রমুখ চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে। নিজ দুঃখের কথা উল্লেখ করে প্রজারা মহাদেবের স্মরণাপন্ন হলে মহাদেব তাদের উপদেশ দেয়-

''শুন রাইয়তগণ,
- - - -
একটা বিন্নার থোপ আনেন উগরিয়া ।
লাংটি চিপি শাপ দেন মঙ্গলবার দিনা ।।
ধন -কাঙ্গালী হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর ।
এয়ার বিচার করিবেন ধর্ম নিরঞ্জন ।।''[৫৬]

ময়নামতী চরিত্রের মধ্যে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ বারংবার পরিলক্ষিত হয়। স্বামী মানিকচন্দ্রের জীবন চুরি করায় যমে-মানুষের দ্বন্দ্ব আমরা উপলব্ধি করি -

''ক্রুদ্ধমান হইয়া ময়না ক্রোধে জ্বলি গেল ।।
মহামন্ত্র গিয়ান নইল হৃদয়ে জপিয়া ।
চণ্ডী কালী রূপ হৈল কায়া বদলিয়া ।।
তৈল পাটের খাঁড়া নিল হস্তে করিয়া ।
'মার, মার' করি যমক নিগায় পিট্টিয়া ।।''[৫৭]

আবার বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যেও সতী ময়নার অলৌকিকতার পরিচয় পাই। উত্তপ্ত তেলে সে সরিষা হয়ে ভেসে থেকেছে -

''মূল মন্ত্র নিয়া নিল হৃদয় জপিয়া ।
সরিষা হৈয়া উঠে ময়না তৈলত ভাসিয়া ।।''[৫৮]

সে সময়ে অলৌকিক বিষয়ের প্রতি সমাজের বিশ্বাস ছিল। গোপীচন্দ্রের স্ত্রীদের হাতে সত্যের পাশা তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাই -

''সত্যের পাশা দেই হস্তে তুলিয়া ।
বার বৎসর খেলেন পাশা তোমার সোয়ামীর নাম লইয়া ।।
এ কড়ায় তৈল দিয়া জোড় রত্ন বাতি ।
এই প্রদীপ জ্বলিবে তোমার কিবা দিবারাতি ।।
দুগ্ধ চাউল থোও তোমার চালে টাঙ্গেয়া ।
জোড় জোড় দাম্বা থোও দরজায় টাঙ্গেয়া ।।
সারি শুয়া পঙ্খি থোও দরজায় টাঙ্গেয়া ।
পসার টলিবে যেদিন পসার হবে চুরি ।
নিশ্চয় জান তোমার সোয়ামী যাইবে যমপুরী ।।
যে দিন তোমার প্রাণপতি আসিবেক ফিরিয়া ।
বিনি আনলে অন্ন পড়িবেক উথলিয়া ।।''[৫৯]

গুরু হাড়িসিদ্ধার মধ্যেও অলৌকিকতার প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। সন্ন্যাস খণ্ডের নানা ঘটনার তা পরিস্ফুট হয়েছে। পথিমধ্যে নিজ ইচ্ছায় মন্ত্র বলে সে গোপীচন্দ্রের পথ শ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় -

''হাড়ি বলে, সূর্যদেব কার পানে চাও ।
তেরটা সূর্যের জ্বালা দেও তো ছাড়িয়া ।।
তলে হউক তপ্ত বালা উপরে রৌদ্রের জ্বালা ।
চলিবার না পারে রাজা শরীর যেন হয় কালা ।।''[৬০]

অতএব সে সময় যে সমাজে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ থাকাটা স্বাভাবিক 'গোপীচন্দ্রের গান' আখ্যায়িকা থেকে মনে হয়। সঙ্গত কারণেই অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ''গোপীচাঁদ আখ্যায়িকাতে যে সমস্ত অতিলৌকিক উপাদান রয়েছে, সেগুলি উদ্ভটতায় ও বিচিত্রতায় যে কোন প্রাচীন কাহিনীকে হার মানায়, কিন্তু তবুও তারা কাব্যোপযোগী হয়েছে কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে এই মায়াবেশের পেলব স্পর্শ। আমাদের সমস্ত প্রবীণতা ও অভিজ্ঞতার অন্তরালে যে একটি স্বপ্নরসপিপাসু মন রয়েছে, এই বর্ণনাগুলি তাকে পরিতৃপ্ত করে।''[৬১]

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে যে সব সামাজিক সংস্কারের ছবি পাই তা যেন আমাদের চেনা পরিচিত সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সন্তান জন্মানোর সময় ধাই মাতারা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন, তার পরিচয় পাই গোপীচন্দ্রের জন্মানোর সময় -

''সোনা দাইর বাড়ি লাগি গমন করিল ।
সোনা দাইর বাড়ি যাইয়া দরশন দিল ।।
- - - - - -
দরিয়ার কূলে যাইয়া দরশন দিল ।
যখন ময়নামতী সোনা দাইক দেখিল ।।
মুখত কাপড় দিয়া ময়না হাসিতে নাগিল ।''[৬২]

নবজাতক জন্মানোর পর নাড়িচ্ছেদ করানো হত। এই নাড়ীচ্ছেদের পর নদীর জলে স্নান করে সন্তানকে মায়ের কোলে দেওয়া হত। এ সমস্ত কিছুই করত ধাই মা,

''একখান কলার নেউজপাত আইস তো ধরিয়া ।
নাড়িচ্ছেদ করিব আমি এখানে বসিয়া ।।
যখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল ।
নেউজ পাত শীঘ্রগতি আনিয়া জোগাইল ।।
নও কড়া কড়ি দিল পাতোত বিছিয়া ।
তিন আঙ্গুল জুখিয়া রাজার নাড়িচ্ছেদ করিল ।।
নাড়িচ্ছেদ করিয়া সোনার হরষিত মন ।
দরিয়ার জল দিয়া করিল ছেনান ।।

ছেনান করিয়া সোনা দাইর হরষিত মন ।
হাসিয়া খেলিয়া দিলে ময়নার কোলাত তুলিয়া ।।''[৬৩]

এরপর বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নামকরণের অনুষ্ঠানও পালিত হত -

''তিন দিন অন্তরে রাজাক তিন কামান করিল ।
চাইর দিন অন্তরে রাজার চতুর্থা করাইল ।।
ব্রাহ্মণ পঞ্চজন আনিয়া তার বেদবিধি করাইল ।
- - - - - - -
আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল ।
ছয় মাস অন্তরে রাজার নামকলম রাখিল ।।
ময়নার গুরু শিব গোরখনাথক আন্‌ল ডাক দিয়া ।
গোপীচন্দ্র নাম থুইল পাটত বসিয়া ।।''[৬৪]

কোনো শুভ কাজের জন্য পাজি-পঞ্জিকার ব্যবহার করে শুভাশুভের দিনক্ষণ ঘটানো হত। সেই চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় গোপীচন্দ্রের বিবাহে -

''এক মঙ্গলবার শুভাশুভ বুঝিল ।
ফের মঙ্গলবার দিনা দরগুয়া করিল ।
ফের মঙ্গলবার দিনা বিবাহ সাজাইল ।।''[৬৫]

শুধু বিবাহে নয়, সেই সমাজে কেউ মারা গেলে তার অন্তিম কৃত্য করার পূর্বে যে লোকাচার পরিলক্ষিত হয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় রাজা মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে -

''পাঁচ লোটা গঙ্গার জলে রাজাক ছিনান করাইল ।
ধৌত বস্ত্র রাজাক পরিধান করাইল ।।
রাজাক নৈল জ্ঞাতা চৌদলে করিয়া
কীর্তনীয়া যায় কীর্তন করিয়া ।।
একটা আমের পল্লব ময়না হস্তে করিয়া ।
সোয়ামীর পাছে পাছে ময়না যাইছে চলিয়া ।।''[৬৬]

এই চিত্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে আজও প্রতিফলিত হতে দেখা যায় ।

সর্বোপরি 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের কাহিনি থেকে বলা যায় যে, এর মধ্যে দিয়ে সেকালের সমাজ জীবনের সুখ, দুঃখ, ভোগবিলাস ইত্যাদির চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ময়নামতী চরিত্রটি ছাড়া হাড়িপা, হীরা নটি, অদুনা, পদুনা, খেতু, ব্রাহ্মণ, নাপিত প্রভৃতি চরিত্র যেন আমাদের পরিচিত সমাজেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। নাথ ধর্মাদর্শের কাহিনি প্রচার করা এই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এর মধ্যে দিয়ে যে সমকালীন বাঙালি সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা বলাই যায়। প্রসঙ্গ শেষ করব ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি সুচিন্তিত মন্তব্য দিয়ে, ''যদিও গ্রাম্য কবিদের কল্পনা বিজড়িত হইয়া এই গানগুলি ইতিহাসের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি সামাজিক ও রাজনৈতিক যে সকল আলেখ্য ইহাতে আছে, তাহাতে প্রাচীনকালের একটা প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। প্রজাশক্তি যে হিন্দুরাজত্বে নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না, বারংবার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে আমরা তাহার নিদর্শন পাইতেছি।''[৬৭]

গোপীচন্দ্রের গান কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্য

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের মৌখিক রূপটি প্রথম সংগ্রহ করেন ড. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন। তিনি ১৮৭৮ খ্রিঃ বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের মুখ থেকে গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু তার কয়েক বৎসর পর ১৯১০-১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঐ একই অঞ্চল থেকে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য গোপীচন্দ্র গানের আর একটি মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ করে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে প্রকাশ করেন। যদিও দুটি গানের ভাষা এবং বিষয়বস্তু মোটামুটি একই রকম। এখন বিষয় হল গোপীচন্দ্রের গান মৌখিক সাহিত্য হওয়ার ফলে এর কাহিনি প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে স্মৃতি শ্রুতি বাহিত হয়ে চলে আসছে। ফলে এই কাব্যের মধ্যে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা এবং আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। সে কারণে গোপীচন্দ্রের গানটিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট যুগের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। সর্বোপরি রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের মুখ থেকে সরাসরি লিখে নেওয়ার ফলে কাব্যটিতে সেই অঞ্চলের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি কাব্যের বানানের ক্ষেত্রেও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গত কারণেই ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য,

''প্রথম সংস্করণ 'গোপীচন্দ্রের গানে'র একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, যদিও ইহা কোন পুথি দেখিয়া সম্পাদিত নয়, গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে যথেচ্ছ ভুল বানান ব্যবহার করা হইয়াছিল। এমনকি, তৎসম শব্দের বানানগুলি পর্যন্ত ভুল করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভুলের যে একটি কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী ছিল, তাহাও নহে। যাহা মুখ হইতে শুনিয়া লেখা, তাহার বানান ভুল করিয়া মুদ্রিত করবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে যেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু হ্রস্ব, দীর্ঘ কিংবা বর্গীয় 'জ', অন্তঃস্থ 'য' তে উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে 'সতী'র পরিবর্তে 'সতি', 'যুক্তি'র পরিবর্তে 'জুক্তি' লিখিবার কি স্বার্থকতা আছে ? সুতরাং বর্তমান সংস্করণে যেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান রক্ষা করিয়া অন্যত্র বানান শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে কাহিনীটি আনুপূর্বিক পাঠ করা সহজসাধ্য হইবে।''[৬৮]

তবে এই কাব্যের ভাষা সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, ''রাজার জন্য প্রথম যে বেদনা গাথার আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই বেদনাজাত কাব্যকথা এ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। ইহা শুধু কাব্য নহে -ইহা গান, ইহা লেখা নহে -বাচনিক আবৃত্তি, সুতরাং ইহা যে গায়কের কণ্ঠে যুগে যুগে নূতন ভাষা পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা যে অতি প্রাচীন গানের অপেক্ষাকৃত নব সংস্করণ তাহাতে ভুল নাই। অনেক স্থলে প্রাচীন ভাষা পর্যন্ত অবিকৃত আছে, আর প্রায় সর্বত্রই ইহাতে প্রাচীন সমাজ ও রীতিনীতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।''[৬৯]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

১। অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে আবার মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন, বইন >ভৈন ইত্যাদি।

উদাহরণ-ক)''ওগো, দিদি, বালক কালে বাপ মায়ে বেচেয়া খাইছে অন্য ঘরে।
<u>ভৈনে</u> ভৈনে দেখা নাহি হয় এ ভব সংসারে ।।''[৭০]

খ) ''রাজা বলে, শুন, ময়না, ময়নামতী <u>বাই</u> ।''[৭১]

এখানে বইনে >ভৈনে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার ভাই >বাই, ধাইমা >দাইমা ইত্যাদি।

২। কাব্যের মধ্যে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন - দক্ষিণ >দকখিণ, দর্শন >দরশন ইত্যাদি।

উদাহরণ - ''দরিয়ার কূলে যাইয়া দরশন দিল ।''[৭২]

৩। অপিনিহিতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন - সাধু >সাউধ, কালি >কাইল, রায়ত >রাইয়ত প্রভৃতি।

উদাহরণ - ''সাউধ সদাগর দেয় খাজনা নাও নৌকা বেচেয়া ।''[৭৩]

৪। এই কাব্যভাষায় কামরূপী উপভাষার মতো কখনো কখনো 'অ' এর উচ্চারণ 'র' আবার কখনো কখনো 'র' এর উচ্চারণ 'অ' হয়েছে। যেমন - অন্ন - রন্ন, রাস্তায় - আস্তায়।

উদাহরণ - (ক) ''আইস, আইস, ঠাকুর মশায় রন্ন খাও আসিয়া ।''[৭৪]

(খ) ''তেপথা আস্তায় রহিল ধিয়ান ধরিয়া ।।''[৭৫]

এখানে 'অ', 'র' হয়েছে কিন্তু 'র', 'অ' হয়নি।

৫। 'ল' ধ্বনি কখনো কখনো 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

যেমন - ''নঙ্গ এলাচি গুয়ামারি জায়ফল যষ্টিমধু মুখের মধ্যে দিয়া ।''[৭৬]

বা ''আপনার মহলক নাগি করিল গমন ।''[৭৭]

৬। কখনো কখনো অন্ত্যস্বরের প্রভাবে মধ্যবর্তী স্বরের লোপ ঘটে। যেমন, বিবাহ - বিভা।

উদাহরণ - ''অদুনাক বিভা কৈল্লে পদুনাক পাইল দানে ।''[৭৮]

৭। আবার অনেক ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে অন্ত্যস্বরধ্বনির লোপ ঘটতে দেখা যায়। যেমন, অতিথি - অতিথ।

উদাহরণ - ''নারী চোরা অতিথ হলে গিরস্তে না দেয় ঠাঞি ।''[৭৯]

৮। বানানের ক্ষেত্রে কখনো কখনো মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন - 'য' এর স্থানে 'জ' এর ব্যবহার।

উদাহরণ - ''কুড়ি জন জম জাওতো সাজিয়া ।''[৮০]

৯। বানানের ক্ষেত্রে অসতর্কতা লক্ষণীয়। একই বানান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন - ময়নামতী >মত্রনামতি, যম >জম, পূন্নিমার চান >পূর্ণিমার চাঁদ, সিনান >ছিনান ইত্যাদি।

উদাহরণ - (ক) ''গোদা বলে, 'শুনেক, ময়না, ময়নামতী মাই ।''[৮১]

(খ) ''জখন মত্রনামতি ধেয়ানত বসিল ।''[৮২]

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

১। কর্মকারকের 'কে' বিভক্তির জায়গায় সাধারণত 'ক' এর ব্যবহার হত। যেমন, যম >যমক।

উদাহরণ - ''শিথানে পৈতানে দুই জন যমক দেখিল ।।''[৮৩]

২। পঞ্চমীর চিহ্ন হিসেবে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার ছিল। যেমন -

''এ গলি হৈতে ময়না ও গলি গেল ।''[৮৪]

৩। কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার পরিলক্ষিত হত। যেমন -

''ছোট রাইয়তে বড় রাইয়তে পরামর্শ করিয়া ।''[৮৫]

৪। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ব্যবহৃত হত। যেমন -

''হেন দুঃখী কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায় ।।''[৮৬]

৫। বাক্যের মধ্যে 'ইয়া', 'ইত', 'ইল' প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল। যেমন -

''আঠার বছরের পরমাই ছিল রাজার ফেলাইল টুটিয়া ।।''[৮৭]

৬। ক্রিয়াপদের সংকুচিত রূপের ব্যবহার ছিল। যেমন - নিয়ে যাব >নিগাব, থুইমু >থুমু। উদাহরণ -

''আইজ ময়নার প্যাংটা থুমু এক দিক করিয়া ।
তলপ চিঠি আনছি রাজার জিউ নিগাব বান্ধিয়া ।।''[৮৮]

৭। কামরূপী উপভাষার প্রভাবের ফলে এই কাব্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহার পূর্বে বসে। যেমন - না খাও, না সোন্দাবে ইত্যাদি।

উদাহরণ - ''ভয় না খাও, মহারাজ, প্রাণে না খাও ডর ।।''[৮৯]

৮। অধিকরণে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হত। যেমন - আঙ্গিনা >আঙ্গিনাত, খেড় >খেড়ত, ঘাড় >ঘাড়ত ইত্যাদি।

উদাহরণ - ''চট্‌কি যাইয়া গোদা যমর ঘাড়ত বসিল ।।''[৯০]

৯। উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে 'আমি' স্থলে মুই, মুঞি, হম এবং 'আমারা' স্থলে হামরা, আমরা ও 'আমার' স্থলে মোর, মোকে ইত্যাদি শব্দ হয়।

উদাহরণ - ''আর আমি পরীখ না নিব মায়ের বরাবর ।
শিব মুড়িয়া ধর্মিরাজ মুঞি ছাড়িম বাড়ি ঘর ।।''[৯১]

১০। মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে 'তুমি' স্থলে তুই, তুঞি এবং 'তোমার' স্থলে তোর, তোরে ও 'তোমাকে' স্থলে তোকে হয়।

উদাহরণ - ''তোর টাকার চাইতে বান্দি, মোর টাকা বিস্তর ।
নিয়া যা তোর টাকা কড়ি, ফিরিয়া যা তুই ঘর ।।''[৯২]

১১। প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে 'সে' সতলে তাঁয়, উঁয়ায়, ওঁয়ার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ - ''না থাকিম ওঁয়ার দেশে অন্য দেশে যাব ।।''[৯৩]

সুতরাং 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যটি রংপুর অঞ্চল থেকে আবিস্কৃত হওয়ায় রংপুর অঞ্চলের ভাষার প্রভাব পড়েছে। কারণ এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল রাজবংশী। স্বভাবত সে কারণেই কাব্যটিতে রাজবংশী ভাষার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একাধিক আখ্যান বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিস্কৃত হলেও গাথাগুলির ভাষা এবং বিষয়বস্তু যে মোটামুটি একইরকম তা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়। প্রসঙ্গত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চল ও রংপুরের ভাষা এক রকম না হইলেও, আলোচ্য গাথাগুলির ভাষায় ও ভাবে স্থানে স্থানে যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।''[৯৪] নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল -

রংপুরের গাথা -

''কালিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও ।
যোয়ান বেটায় না পোষে বৃদ্ধ বাপ মাও ।।''[৯৫]

বা,

''রাজা হৈয়া না করে রাজ্যের বিচার ।
পুত্র হৈয়া না করে যায় পিতার উদ্ধার ।।
নারী হৈয়া না করিবে যায় স্বামীর ভকতি ।
শিষ্য হৈয়া না ধরে গুরুর আরতি ।।''[৯৬]

ভবানীদাসের পুথি -

''কলির প্রবেশ হৈলে ধর্ম হৈব নাশ ।
বিধর্ম করিয়া সবে করিব বিনাশ ।।
রাজা হৈয়া না করিব রাজ্যের বিচার ।
শাস্ত্রনীতি না মানি করিব অনাচার ।।
- - - - - -
পুত্র সবে না করিব পিতার পালন ।
স্বামীভক্ত না হৈব নারী সবের মন ।।''[৯৭]

রংপুরের গাথা -

''হাড়ির খাইছ গুয়া মা হাড়ির খাইছ পান ।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান ।।''[৯৮]

ভবানীদাসের পুথি -

''হাড়িয়ার লগে যুক্তি হাড়িনীর লগে কথা ।
হাড়ি লগে বসি খায় পান এক বাটা ।।''[৯৯]

রংপুরের গাথা -

''বগ্‌দুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয় ।।''[১০০]

ভবানীদাসের পুথি -

''থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ ।।''[১০১]

সুকুর মামুদের গ্রন্থে -

''থোড় কলা বাদুলে খাইলে কলা ডাঙ্গর লয় ।।''[১০২]

অতএব দেখা গেল গাথাগুলির বিষয় ও ভাষা মোটামুটি একইরকম। তবে আমাদের আলোচনা যেহেতু 'গোপীচন্দ্রের গান'কে নিয়ে তাই এখানে যে সমস্ত **আঞ্চলিক শব্দ** বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সমস্ত শব্দ আজও উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জন সমাজে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন -

১। অঁয় (ও, উহা) : ''তোমার ঘরের ছেইলা অঁয় বড় রসিয়া ।''[১০৩]

২। আগিনা (উঠান, অঙ্গন) : ''মইষকাটা মইষাসুরা নেইস আগিনায় গড়িয়া।''[১০৪]

৩। আদ্দুর (খানিক দূর) : ''আদ্দুর হোতে টিকার চামড়া কাটিয়া নামাইল।।''[১০৫]

৪। আলে (ছলে) : ''ঔষধ করিবার আলে যম জন পালাইল ।''[১০৬]

৫। ইন্দুর (ইঁদুর) : ''ইন্দুর সলেয়ার বাসা আর মাকড়শার জালি ।''[১০৭]

৬। উবজিল (উৎপন্ন হল) : ''আগে উবজিল ছোটো ভাই পাছে উবজিল দাদা।''[১০৮]

৭। উবাওঁ (বহন করা) : ''বার বছর জল উবাওঁ হীরা নটীর বাড়ি ।''[১০৯]

৮। উসনা আলু (সিদ্ধ আলু) : ''উসনা আলুর মত তুল হানিয়া ।''[১১০]

৯। এলা (এখন) : ''মুঞি হাড়ি যাওঁ এলা আপনার মহল ।''[১১১]

১০। ঐঠে (ঐ স্থানে) : ''ঐঠে হৈতে বুড়ী ময়না দালানে সন্দাইল ।''[১১২]

১১। ওরস (ছারপোকা) : ''ওরসের লেখা নাই উকুন ডালি ডালি ।''[১১৩]

১২। ওসার (বিস্তার) : ''ছয় মাসে ওসার নদী বৎসরে পড়ে খেওয়া ।''[১১৪]

১৩। কইতর (পায়রা) : ''কইতর হৈয়া গোদা যম সগ্‌গে উড়াইল ।''[১১৫]

১৪। কাকেয়া কাকেয়া (চুল আচড়ানো) : ''কাকেয়া কাকেয়া নটী চুলের ভাঙ্গে জালি।''[১১৬]

১৫। কোকেয়া কোকেয়া (যন্ত্রনায় ছটপট করা) :

''বধূর কথা শুনি ময়নার গাওতে আইল জ্বর ।
কোকেয়া কোকেয়া সান্দাইল ঝাট মন্দির ঘর ।।''[১১৭]

১৬। কোন ঠাগার (কোথাকার) : ''কোন ঠাগার বোষ্টম একটা আসছে সাজিয়া।''[১১৮]

১৭। খুপুরি (ক্ষুদ্র গৃহ) : ''থাকিবার শয়ণ দিবে ছাগলের খুপুরি ।''[১১৯]

১৮। গাবুর (যুবক) : ''এছিলাক গাবুরাক দেখি খসম পাকড়িবে ।''[১২০]

১৯। গাভুরালি (যৌবন) : ''এমত বয়সে ছাড়ি যাও বৃথায় গাভুরালি ।''[১২১]

২০। গারস্তি (গৃহকর্ম) : ''কালাই বেচি খডিক এখন গারস্তি করিয়া ।''[১২২]

২১। গিত্তানি (গৃহর্কত্রী) : ''যে বাড়ীর গিত্তানী হৈয়া সন্ধ্যায় বাণে বাড়া ।'' ১২৩

২২। গুয়া (সুপারি) : ''গুয়া খোয়া বিশি নিলে খোঁপায় গুঞ্জিয়া ।''[১২৪]

২৩। ঘড়িক (ক্ষণিক) : ''গেয়ান পরীক্ষা নিবে এর ঘড়িকের ভিতর ।''[১২৫]

২৪। ঘাটা (পথ) : ''এলুয়াবাড়ি বেলুয়াবাড়ি কাসিয়াবাড়ি দি ঘাটা ।''[১২৬]

২৫। ঘিন (ঘৃণা) : ''ঘিনে বান্দী নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া ।''[১২৭]

২৬। চ্যাংরা (বালক) : ''চ্যাংরা চ্যাংরা যম সাজিল মাথায় সোনার টুপি ।''[১২৮]

২৭। ছাওয়াল (সন্তান) : ''খাজনার তাপত বেচায় দুধের ছাওয়াল ।''[১২৯]

২৮। ছাপরিয়া (হেঁট হয়ে) : ''ডোমনা কাওড়া নোটন নাচে ময়নাবুড়ী ছাপরিয়া ছাপরিয়া।''[১৩০]

২৯। ছেকিয়া (শুষ্ক করা) : ''ডান হাতে দরিয়ার জল ফেলাইবে ছেকিয়া ।''[১৩১]

৩০। ছোরান (চাবিকাঠি) : ''নিগাল ছোরান খানি ঘুচাইল ঢাকানি ।''[১৩২]

৩১। জাবুরা (আর্বজনা) : ''এক এক করি খার জাবুরাক খাইছে গিলিয়া ।''[১৩৩]

৩২। জার (শীত) : ''মাঘ মাসিয়া জারত দিবে বুড়া একখান চটি ।''[১৩৪]

৩৩। জাহান (প্রাণ) : ''জাহান হারাইতে আইলাম বুড়া মায়ের বচনে ।''[১৩৫]

৩৪। জীউ (বেঁচে থাকা) : ''রাজার জীউ নিল লাংটিতে বান্ধিয়া ।''[১৩৬]

৩৫। জোলা (র্নিবোধ) : ''জোলা মরদ ভাবে তিনি মাথায় হস্ত দিয়া ।''[১৩৭]

৩৬। টিকা (গুহদ্বার) : ''আদ্দুর হোতে টিকার চামড়া নামাইল কাটিয়া ।''[১৩৮]

৩৭। টেড়িয়া (বাঁকা) : ''টেড়িয়া করি পাগ্‌ড়ি বান্ধি ছায়ার দিকে চায় ।''[১৩৯]

৩৮। ঠ্যাং (পা, পদ) : ''তোর ছোট ভাই আছে বাম ঠ্যাংয়া গোদ ।''[১৪০]

৩৯। ডাং (দণ্ড) : ''তিন ডাং ডাঙ্গাইলে আর কুজতে আসিয়া ।''[১৪১]

৪০। ডিগি (দীঘি) : ''পাষাণ দিয়া ডিগির দেও চার ঘাট বান্ধিয়া ।''[১৪২]

৪১। তেইলানি (তেল বিক্রয়কারিণী) : ''বান্ধা নেও, বান্ধা নেও তেইলানি হের বাই।''[১৪৩]

৪২। থুকরা (জঞ্জাল বা আবর্জনা) : ''এক মুঠ থুকরা দিয়া অন্ন রাখিলে ঢাকিয়া।''[১৪৪]

৪৩। দন্ বাগড়া (দ্বন্দ্ব-কলহ) : ''দন ঝগড়ায় না ছাড়ে শাখার ভকতি ।''[১৪৫]

৪৪। দোরোঙ্গ (ভাঙ্গনের পাড়) : ''নদীর দোরঙ্গের নাকান আনেত ভাঙ্গিয়া ।''[১৪৬]

৪৫। নাকান (তুল্য) : ''বাঘের নাকান এঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে ।''[১৪৭]

৪৬। নাগাল (সন্ধান) : '' ঘাটায় পথে নাগাল পাইলে জীউ আনি ছিনিয়া ।''[১৪৮]

৪৭। নাংটি (কৌপিন) : ''নাংটি পিন্ধা হবে গুরু ধুতি পিন্ধা শিষ্ ।''[১৪৯]

৪৮। নেউজ পাত (নতুন কলাপাত) : '' একখান কলা নেউজ পাত আইস তো ধরিয়া।''[১৫০]

৪৯। ন্যাদে (পদাঘাতে) : ''এক্কে ন্যাদে ময়নার ধন ন্যাদেয়ে ফেলিল ।''[১৫১]

৫০। ন্যাংরা (মোটা দড়ি) : ''হালের ন্যাংরা নিল হালুয়া গালাতে পাল্টায়া।''[১৫২]

৫১। পিট্টিয়া (তাড়া করে) : ''এইতো যমক, প্রাণমতি, থুইলাম পিট্টিয়া ।''[১৫৩]

৫২। পিন্ধে (পরিধান করে) : ''তার পশ্চাত পিন্ধে খোঁপা গুঞ্জরি ভোমরা ।''[১৫৪]

৫৩। বগ্দুল (বাদুড়) : ''বগ্দুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয় ।''[১৫৫]

৫৪। বনুস (স্ত্রী) : ''ছাইলার জন্য আমার বনুস যাইছে শুকিয়া ।''[১৫৬]

৫৫। ব্যাগল (পৃথক) : ''দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল ।''[১৫৭]

৫৬। ভোক (খিদে লাগা) : ''ভোকের কালে অন্ন দিব তিয়াস কালে পানি ।''[১৫৮]

৫৭। ভ্যারোতে (কাঁদায়) : ''টোরা গছি মাছ হইয়া ভ্যারোতে সোন্দাইল ।''[১৫৯]

৫৮। মাইয়া (স্ত্রীলোক) : ''মাইয়া পিট্টিয়া আন্লে ময়দানের উপর ।''[১৬০]

৫৯। সামটায় (পরিষ্কার করা) : ''ছাড়ঙা থড়ির ঝাঁটা হাট খোলা সামটায় ।''[১৬১]

৬০। সৌক (সকল) : ''সৌক যম সাজিয়া গেল আবাল যমের বাড়ি ।''[১৬২]

৬১। সোয়ামি (স্বামী) : ''সোয়ামীর পাছে পাছে ময়না যাইছে চলিয়া ।।''[১৬৩]

৬২। হস্‌কিয়া (ফস্‌কিয়ে) : ''হাত হস্‌কিয়া গোদা যম পলায়ন হৈল ।''[১৬৪]

৬৩। হাউস (আশা) : ''হাউসাত থাকি বিছায়া দে তুই হৃদয়ের কুঙর ।''[১৬৫]

৬৪। হাবিলাস (অভিলাষ) : ''সরা কঁ্যাথা বৃক্ষের তলে নিন্দের হাবিলাস ।''[১৬৬]

৬৫। হিদ্দি (হৃদয়) : ''হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বাণারসী ।''[১৬৭]

ছন্দ অলংকারের দিক থেকেও 'গোপীচন্দ্রের গান' বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। মূলত গায়েনের মুখ থেকে লিখে নিলেও সেগুলির মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী এবং লাচারী ছন্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। সে কারণে 'গোপীচন্দ্রের গান' গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অলংকারের ক্ষেত্রে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অনুপ্রাস প্রভৃতির ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন উপমা অলংকারের একটি দৃষ্টান্ত হল -

''কাটা বৃক্ষের লাকান ঢলিয়া পড়িল ।''[১৬৮]

উৎপ্রেক্ষা অলংকার -

''আপনার স্বামীকে দেখে নিম যেন তিতা ।
পরার পুরুষ দেখে যেন সংসারের মিতা ।।''[১৬৯]

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে কতকগুলি প্রবাদ প্রবচনের পরিচয় পাওয়া যায়, যার মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। নিম্নে কয়েকটি **প্রবাদ প্রবচনের** উল্লেখ করা হল -

১। ''দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী ।
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী ।।''[১৭০]

২। ''ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিষয় পায় ।
টেড়িয়া করি পাগ্‌ড়ি বান্ধি ছায়ার দিকে চায় ।।
বাঁশের পাতারি নাকান ফ্যার ফ্যারিয়া বেড়ায় ।''[১৭১]

৩। ''এক থোবের বাঁশ, রাণী নছিবেতে লেখা ।
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝাঁটা ।।
এতেক ফুলের সাজি হাতে মাতে রয় ।
ছাড়ঙা হাড়ির ঝাঁটা হাট খোলা সামটায় ।।''[১৭২]

৪। ''নছিবেতে ফলে ধন শুকানে ডিঙ্গা চলে ।
নছিব বিরোধ হৈলে নানা রোগে ধরে ।।''[১৭৩]

৫। ''মাছে চিনে গহীন জমিন পক্ষী চিনে ডাল ।
মায় চেনে পুতের দয়া যার বক্ষে শাল ।।''[১৭৪]

৬। ''হিন্দি গয়া হিন্দি গঙ্গা হিন্দি বাণারসী ।
মুখে হলো তোর জপতপ মস্তকে তুলসী ।।''[১৭৫]

৭। ''যে বাড়ীর গিত্তানী হৈয়া সন্ধ্যায় বানে বাড়া ।
বাঁশের তলে কান্দে লক্ষ্মী না যায় হাবাতিপা.ড়া ।।''[১৭৬]

৮। ''হাট করে হাটুয়া যেমন পথের পরিচয় ।
হাট ভাঙ্গিয়া গেলে কারো কেউ নয় ।।''[১৭৭]

৯। ''বগ্‌দুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয় ।
ভাঙ্গা ঘরে ঢোকা দিলে অবশে চার দিন রয় ।।''[১৭৮]

১০। ''বিধাতার কলম খণ্ডান না যায় ।
ভাঙ্গা জোড়া দুইটি কর্ম বিধাতা করায় ।।''[১৭৯]

১১। ''কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও ।
যোয়ান বেটায় না পোষে বৃদ্ধ বাপ মাও ।।''[১৮০]

১২। ''অকুণ্ডল নারী হইয়া পুরুষ বাছিবে ।
বয়সের কুহতে ছাইলা পিতাক ঢেকাইবে ।।''[১৮১]

১৩। ''গুরু সাচা পিণ্ডি কাচা সংসারে কয় ।''[১৮২]

১৪। ''গুরু না ভজিলে দেহ শৃগালে না খায় ।
অপমৃত্যু দেহ হৈলে কাকে ছাড়ি খায় ।।''[১৮৩]

১৫। ''বাঘের নাকান এঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে ।
মায়ের নাকা অন্ন স্পর্শে ব্রহ্মার নাকা চোসে ।।''[১৮৪]

১৬। ''কদুমনি বধূ কদমের তলে বাসা ।
কখন খায় ঘৃত অন্ন কখন উপদশা ।।''[১৮৫]

১৭। ''শঙ্খিনী নারী শাঙ্খার উনমতি ।
দন্ ঝগড়ায় না ছাড়ে শাঙ্খার ভকতি ।।''[১৮৬]

১৮। ''স্বামীর পাতে অন্ন দিয়া যায় শাঙ্খা মাজিবার ।
শাঙ্খা মাজিয়া বধূ হস্তের দিকে চায় ।।
কোন দিকে ভাল পুরুষ পন্থ বৈয়া যায় ।
হাতের ছিঞালি দিয়া বধূ ভ্রমরা ভুলায় ।।''[১৮৭]

১৯। ''হস্তিনী বধূ, যাদু হস্তখানি মাঞ্জা ।
কাখে কোলে নাই ছাইলা তায় জনমের বাঞ্জা ।।''[১৮৮]

২০। ''আপনার স্বামীক দেখে নিম যেন তিতা ।
পরার পুরুষ দেখে যেন সংসারের মিতা ।।''[১৮৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মনে হয় যে 'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের ভাষায় রংপুর অঞ্চল তথা রাজবংশী ভাষার যথেষ্ট ছাপ রয়েছে। কাব্যের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ভাষা বৈশিষ্ট্যের সকল পরিচয় রয়েছে বলে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি যুক্তি দেখিয়েছেন, ''গানটি রংপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল। ভাষা দেখিলেও রংপুরের উত্তরাংশের বোধ হয়। - - - রংপুরের গ্রাম্য ভাষায় রাজবংশী ভাষা মিশিয়া গিয়াছে।''[১৯০] সুতরাং কাব্যটিকে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক তথা রাজবংশী ভাষায় রচিত কাব্য নিদর্শন যা শুধু কোচবিহার, গোয়ালপাড়া বা রংপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে সমগ্র বঙ্গভূমির।

উল্লেখপঞ্জি

১। মল্লিক, শ্রী কল্যাণী : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০, পৃ - ১ ।

২। দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান - দ্বিতীয় ভাগ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪, পৃ - ১১৮০ ।

৩। মন্ডল, শ্রীপঞ্চানন : গোর্খাবিজয়, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৯৯৭, সুকুমার সেন লিখিত ভূমিকা, পৃ - ৫৯ ।

৪। তদেব, পৃ - ৫৯ ।

৫। মুখোপাধ্যায়, সুখময় বাংলার নাথ সাহিত্য, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ -১ ।

৬। বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৯-১০, পৃ - ২২৭ ।

৭। মুখোপাধ্যায় সুখময় : তদেব, পৃ - ২ ।

৮। মল্লিক, শ্রী কল্যাণী : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, তদেব, পৃ - ১৩৭ ।

৯। বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, তদেব, পৃ - ২৫৫-২৫৬ ।

১০। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ সম্পাদিত : গোপীচন্দ্রের গান, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, ভূমিকাংশ, পৃ - ৯ ।

১১। সেন, ড. দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, আগস্ট ২০০২, পৃ - ৫৬ ।

১২। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, ভূমিকা, পৃ - ছত্রিশ ।

১৩। তদেব, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ - ৪৬৪ ।

১৪। তদেব, পৃ - ৪৫০ ।

১৫। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত : কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ - বত্রিশ ।

১৬। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ৪৫০ ।

১৭। তদেব, পৃ - উনত্রিশ-ত্রিশ ।

১৮। তদেব, পৃ - তেত্রিশ ।

১৯। সেন ড. দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, তদেব, পৃ - ৫৭ ।

২০। ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ২৭৮

২১। ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ : তদেব, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ - ৪৭৬ ।

২২। খান চৌধুরী আমানতুল্লা আহমেদ : কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সম্পাদিত - হিতেন নাগ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ - ২৪ ।

২৩। তদেব, পৃ - ২৩ ।

২৪। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ১ ।

২৫। তদেব, পৃ - ২২৪ ।

২৬। তদেব, পৃ - ১৯৭ ।

২৭। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ - ৪৭৮।

২৮। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত : কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, তদেব, পৃ - ২ ।

২৯। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ : কোচবিহারের ইতিহাস, তদেব, পৃ - ২৪ ।

৩০। ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, ভূমিকা, পৃ - দশ ।

৩১। তদেব, ভূমিকা, পৃ - নয় ।

৩২। তদেব, ভূমিকা, পৃ - এগারো ।

৩৩। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ১ ।

৩৪। তদেব, পৃ - ৪০ ।

৩৫। তদেব, পৃ - ৩৯ ।

৩৬। তদেব, পৃ - ১ ।

৩৭। তদেব, পৃ - ১-২ ।

৩৮। তদেব, পৃ - ২ ।

৩৯। তদেব, পৃ - ২ ।

৪০। তদেব, পৃ - ৬ ।

৪১। তদেব, পৃ - ১০ ।

৪২। তদেব, পৃ - ৬৭ ।

৪৩। তদেব, পৃ - ৪৬ ।

৪৪। তদেব, পৃ - ১৩৩ ।

৪৫। তদেব, পৃ - ১৯৮-৯৯ ।

৪৬। তদেব, পৃ - ভূমিকা, এগারো ।

৪৭। তদেব, পৃ - ৪০ ।

৪৮। চৌধুরী, ভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ - ৫৩ ।

৪৯। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ১৪৯ ।

৫০। তদেব, পৃ - ৩৮৮-৮৯ ।

৫১। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

৫২। তদেব, পৃ - ১৪৩-৪৪ ।

৫৩। তদেব, পৃ - ৪৪ ।

৫৪। তদেব, পৃ - ১৩৪ ।

৫৫। তদেব, পৃ - ১৯৪ ।

৫৬। তদেব, পৃ - ৫ ।

৫৭। তদেব, পৃ - ১২ ।

৫৮। তদেব, পৃ - ৭৭ ।

৫৯। তদেব, পৃ - ১৬২ ।

৬০। তদেব, পৃ - ১৮৯ ।

৬১। মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলার নাথসাহিত্য, তদেব, পৃ - ৪১ ।

৬২। ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ৩৫-৩৬ ।

৬৩। তদেব, পৃ - ৩৬ ।

৬৪। তদেব, পৃ - ৩৭-৩৮ ।

৬৫। তদেব, পৃ - ৪০ ।

৬৬। তদেব, পৃ - ৩২ ।

৬৭। ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ - ৪৪০-৪৪১ ।

৬৮। তদেব, পৃ - দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন, সাত-আট ।

৬৯। তদেব, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ - ৪৩২ ।

৭০। ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ : গোপীচন্দ্রের গান, তদেব, পৃ - ২৬ ।

৭১। তদেব, পৃ - ১০ ।

৭২। তদেব, পৃ - ৯৭ ।

৭৩। তদেব, পৃ - ২ ।

৭৪। তদেব, পৃ - ১১৫ ।

৭৫। তদেব, পৃ - ২১৮ ।

৭৬। তদেব, পৃ - ৬৬ ।

৭৭। তদেব, পৃ - ৭ ।

৭৮। তদেব, পৃ - ৪০ ।

৭৯। তদেব, পৃ - ১৫০ ।

৮০। তদেব, পৃ - ১৪ ।

৮১। তদেব, পৃ - ১০ ।

৮২। তদেব, পৃ - ১৪ ।

৮৩। তদেব, পৃ - ৯ ।

৮৪। তদেব, পৃ - ২৪ ।

৮৫। তদেব, পৃ - ৩ ।

৮৬। তদেব, পৃ - ২ ।

৮৭। তদেব, পৃ - ৬ ।

৮৮। তদেব, পৃ - ৯ ।

৮৯। তদেব, পৃ - ৮ ।

৯০। তদেব, পৃ - ২৬ ।

৯১। তদেব, পৃ - ১১০ ।

৯২। তদেব, পৃ - ১১৩ ।

৯৩। তদেব, পৃ - ১১৪ ।

৯৪। তদেব, পৃ - ৪৯৪ ।

৯৫। তদেব, পৃ - ৫২ ।

৯৬। তদেব, পৃ - ১৫০ ।

৯৭। তদেব, পৃ - ২৭৬-৭৭ ।

৯৮। তদেব, পৃ - ৪৬ ।

৯৯। তদেব, পৃ - ২৮৭ ।

১০০। তদেব, পৃ - ৫৫ ।

১০১। তদেব, পৃ - ২৮৯ ।

১০২। তদেব, পৃ - ৩৬৪ ।

১০৩। তদেব, পৃ - ২৪৭ ।

১০৪। তদেব, পৃ - ১২১ ।

১০৫। তদেব, পৃ - ৩০ ।

১০৬। তদেব, পৃ - ২১ ।

১০৭। তদেব, পৃ - ১৫২ ।

১০৮। তদেব, পৃ - ১০৪ ।

১০৯। তদেব, পৃ - ২৩৫ ।

১১০। তদেব, পৃ - ৭৮ ।

১১১। তদেব, পৃ - ২৫৬ ।

১১২। তদেব, পৃ - ১৬ ।

১১৩। তদেব, পৃ - ১৫২ ।

১১৪। তদেব, পৃ - ৯০ ।

১১৫। তদেব, পৃ - ২৬ ।

১১৬। তদেব, পৃ - ২১৮ ।

১১৭। তদেব, পৃ - ৫৩ ।

১১৮। তদেব, পৃ - ২১০ ।

১১৯। তদেব, পৃ - ৫০ ।

১২০। তদেব, পৃ - ৫৪ ।

১২১। তদেব, পৃ - ১৪৯ ।

১২২। তদেব, পৃ - ২০৪ ।

১২৩। তদেব, পৃ - ৫৮ ।

১২৪। তদেব, পৃ - ৩৬ ।

১২৫। তদেব, পৃ - ২৫০ ।

১২৬। তদেব, পৃ - ১০৪ ।

১২৭। তদেব, পৃ - ২ ।

১২৮। তদেব, পৃ - ১৮৪ ।

১২৯। তদেব, পৃ - ২ ।

১৩০। তদেব, পৃ - ৭৬ ।

১৩১। তদেব, পৃ - ২৩০ ।

১৩২। তদেব, পৃ - ২১৮ ।

১৩৩। তদেব, পৃ - ২৭ ।

১৩৪। তদেব, পৃ - ৫০ ।

১৩৫। তদেব, পৃ - ২২৬ ।

১৩৬। তদেব, পৃ - ১৮ ।

১৩৭। তদেব, পৃ - ৫৭ ।

১৩৮। তদেব, পৃ - ১৯০ ।

১৩৯। তদেব, পৃ - ১৬৭ ।

১৪০। তদেব, পৃ - ২২৯ ।

১৪১। তদেব, পৃ - ২০৪ ।

১৪২। তদেব, পৃ - ১৯০ ।

১৪৩। তদেব, পৃ - ১৯৭ ।

১৪৪। তদেব, পৃ - ১৫২ ।

১৪৫। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৪৬। তদেব, পৃ - ৫৭ ।

১৪৭। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৪৮। তদেব, পৃ - ১৯ ।

১৪৯। তদেব, পৃ - ৫২ ।

১৫০। তদেব, পৃ - ৩৬ ।

১৫১। তদেব, পৃ - ১২ ।

১৫২। তদেব, পৃ - ২৫৮ ।

১৫৩। তদেব, পৃ - ১৩ ।

১৫৪। তদেব, পৃ - ২১৯ ।

১৫৫। তদেব, পৃ - ৫৫ ।

১৫৬। তদেব, পৃ - ৫৭ ।

১৫৭। তদেব, পৃ - ১ ।

১৫৮। তদেব, পৃ - ১৪৯ ।

১৫৯। তদেব, পৃ - ২৭ ।

১৬০। তদেব, পৃ - ১৫ ।

১৬১। তদেব, পৃ - ৪৪ ।

১৬২। তদেব, পৃ - ৩২ ।

১৬৩। তদেব, পৃ - ১৮৩ ।

১৬৪। তদেব, পৃ - ২৪ ।

১৬৫। তদেব, পৃ - ২১৬ ।

১৬৬। তদেব, পৃ - ১৫৩ ।

১৬৭। তদেব, পৃ - ৬০ ।

১৬৮। তদেব, পৃ - ৭৭ ।

১৬৯। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৭০। তদেব, পৃ - ৭৮ ।

১৭১। তদেব, পৃ - ১৬৭ ।

১৭২। তদেব, পৃ - ২১৮ ।

১৭৩। তদেব, পৃ - ১৫৪ ।

১৭৪। তদেব, পৃ - ৭৯ ।

১৭৫। তদেব, পৃ - ৬০ ।

১৭৬। তদেব, পৃ - ৫৮ ।

১৭৭। তদেব, পৃ - ৫৫ ।

১৭৮। তদেব, পৃ - ৫৫ ।

১৭৯। তদেব, পৃ - ৩১ ।

১৮০। তদেব, পৃ - ৫২ ।

১৮১। তদেব, পৃ - ৫২ ।

১৮২। তদেব, পৃ - ৫২ ।

১৮৩। তদেব, পৃ - ৫২ ।

১৮৪। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৮৫। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৮৬। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৮৭। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৮৮। তদেব, পৃ - ৫৭ ।

১৮৯। তদেব, পৃ - ৫৬ ।

১৯০। ভট্টশালী, নলিনীকান্ত : গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ১৯২৫, পৃ - ৫।